আওলাদমিয়ার ভাতের হোটেল

নিয়াজ মেহেদী



আওলাদ মিয়ার ভাতের হোটেল

নিয়াজ মেহেদী

ই-বুক প্রকাশক

বইঘর

ই. বি. সল্যুশন্স লিমিটেড

প্রথম বইঘর সংস্করণ

অক্টোবর, ২০২১

প্রারম্ভিকা

'শীত কী জিনিস জানতে হলে তোকে উত্তরবঙ্গে যেতে হবে। নভেম্বর থেকে মার্চ, এরমধ্যে যে কোনো সময় বাড়িতে চলে আসবি। আমাকে কিছু বলতে হবে না। শীতই তার অ্যাকশন দেখায়া দেবে। তুই খালি দুই পাটি দাঁতের বাড়ির শব্দ শুনবি আর কইবি, 'হে আল্লাহ এ আমারে কই আইনা ফেললা?'

বছর পাঁচেক আগের এক উষ্ণ নভেম্বরে হাকিম চত্বরে বসে আমাকে কথাগুলো বলেছিল বন্ধু সেলিম। ঢাকা শহর ওর পছন্দের জায়গা ছিল না। পর্ন থেকে পলিটিক্স- আড্ডার যেকোনো বিষয়ে তার কথা গিয়ে শেষ হতো উত্তরবঙ্গে। বন্ধুমহলে আমরা যারা অউত্তরের মানুষ তারা এ নিয়ে তাকে বিস্তর টিটকারি মারতাম। কিন্তু সে নির্বিকার থাকতো। বলতো, 'তোরা তো কখনও সেতু পার হইস নাই। না জাইনা একটা জায়গারে পচানি দিস ক্যান?'

আমরা হাহা-হিহি করে তার আপত্তি উড়িয়ে দিতাম। হাকিম চত্বরের আড্ডায় সেলিমের একটা নাম দিয়েছিলাম আমরা, 'মফিজ সেলিম'। আজ পাঁচ বছর পর দুম করে নামটা মনে পড়ে গেল। যখন জানতে পারলাম সেলিম আর পৃথিবীতে নেই।

সেলিমের গল্পটা অদ্ভুত। চিরকালই ও ছিল খানিকটা খাপছাড়া ধরনের। গ্রামের ছেলে, কিন্তু কথায় এমন উইট ছিল যে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস ছিল সেলিমের। কাঁধের ব্যাগে বিসিএসের গাইড নিয়ে আমরা যখন সেন্ট্রাল লাইব্রেরির দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতাম, ও তখন হলের বিছানায় শুয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো রুদ্র, শক্তি ও আবুল হাসানের কবিতায়। জোছনারাতে হঠাৎ করে জগন্নাথ হলে এসে আমার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতো। ওর জন্যই মন্দিরের বেদীতে শুয়ে শেষরাত পর্যন্ত জোছনা দেখতে হতো। পলাশীর আদা দেওয়া দুধ চা

খেয়ে গিটারে টুংটাং করা ছেলেদের দলে আমরা মিশে যেতাম। আমার যে এসব করতে খারাপ লাগতো তা না। এসব পাগলামির জন্যই আমি সেলিমকে ভীষণ পছন্দ করতাম।

মাস্টার্স পাস করার পর আমরা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে গেলাম বিসিএসের প্রিলি-রিটেন নিয়ে। অন্যরা নাম লেখালো কর্পোরেট চাকরিতে। ক্যারিয়ারের গ্রাফ উঁচু করতে গিয়ে আমাদের হাকিম চত্বরের সান্ধ্য আড্ডাটা ভেস্তে গেল। শুরুতে শুক্রবার সবাই আসতো। আস্তে আস্তে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। খসে পড়া উল্কাপিণ্ডের মতো আমরা ছিটকে গেলাম বিভিন্ন জায়গায়। নতুন বন্ধু- সহকর্মী-প্রেমিকা-স্ত্রীদের নিয়ে ডুব দিলাম নতুন জগতে। ভার্সিটির আড্ডার দিনগুলো ধীরে ধীরে পরিণত হলো ধূসর স্মৃতিতে। নতুন জীবনে হাঁপ ধরে গেলে যা নিউরনে যৎসামান্য উত্তাপ ছড়াতো ।

সেলিমের সর্বশেষ খবর বেশ করুণ। ছাত্রত্ব শেষ হওয়ায় ওকে হল ছাড়তে হয়েছিল। উপায় না দেখে সে নিজের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কষ্ট করে হয়তো আজিমপুরের ঘিঞ্জি মেসে থেকে যেতে পারতো। কিন্তু ঢাকায় থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করার কোনো ইচ্ছা ওর ছিল না। শুরু থেকে সে বলতো, ওর জীবনের লক্ষ্য হলো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হওয়া। সেটাই সে হয়েছিল। ঘাঘটডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সেলিম ফেসবুকে স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ছবি পোস্ট করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও সেলিমের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হওয়াটাকে বন্ধুদের অনেকেই সহজভাবে নেয়নি। কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তির পর ফেসবুকে বসে ওর শিক্ষক জীবনের ছবিগুলো দেখলে ভীষণ ঈর্ষা হতো। মনে হতো সেলিমের মতো সুখী আমরা কেউই হতে পারিনি।

ওর মৃত্যুর খবরটাও এই ফেসবুকেই পেয়েছি। সাপের কামড়ে মারা গেছে বেচারা । রাতে বাজার থেকে ফিরছিল, এমন সময় সাপে কামড়েছে। শুনেছি ঘটনাস্থল ওদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। সেলিমের চিৎকারে লোকজন চলেও এসেছিল। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পথে ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোতে শুরু করে। তারপর সব শেষ। সেলিমের মৃত্যুর খবর পেয়ে যতটা না শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম,

তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেলাম বাকি বন্ধুদের আচরণে। আমার মতো অনেকেই খবরটা অন্তর্জালে দেখেছিল। টাইমলাইন ভরিয়ে দিয়েছিল স্যাড রিঅ্যাক্টে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুর কবরে দুই মুঠ মাটি দেয়ার জন্য কারও সময় নেই। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। চাকরি-বিয়ে, শ্বশুরবাড়ি-বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে কারও দম ফেলার ফুরসৎ নেই। দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলার সময় হলো না কারো। শুধু ভার্চুয়াল জগতে উহু আহা করে সবাই দায়িত্ব সেরে নিলো।

মহাব্যস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম একাই সেলিমকে বিদায় জানাবো। ওর শেষশয্যায় রেখে আসবো ওরই প্রিয় ফুল রডোডেনড্রন। উত্তরবঙ্গে কখনো যাইনি। সারাদিন একবুক ব্যথা নিয়ে অফিস করে চলে গেলাম কল্যাণপুর। সেখান থেকে উঠে পড়লাম রংপুরের বাসে।

বাসে আমার ঘুম হয় না। আধো তন্দ্রামতন হয়। মনের মাঝে বারবার ভেসে উঠছিল সেলিমের মুখ। হঠাৎ মনে পড়লো ওর কাছ থেকে ধার নেওয়া কয়েকটা বই ফেরত দেওয়া হয়নি। বইগুলো সঙ্গে আনলেই পারতাম। ছেলের স্মৃতি পেলে ওর বাবা-মা নিশ্চয়ই খুশি হতো।

আহমদ শরীফের 'বিচিত প্রবন্ধ' বলে একটা বই ধার নিয়েছিলাম ওর থেকে বইটার প্রথম পাতায় মধ্যযুগের কবি হেয়াত মামুদের দুটি লাইন লিখে রেখেছিল সেলিম, ‘যার বিদ্যা নাই সে জানে না ভালো-মন্দ, শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ ত

বুকটা কষ্টে ভরে গেল। এই অন্ধ চোখে আলো ফোটানোর জন্য সেলিম বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমি বলবো সেলিমের মৃত্যুতে কিছু ছেলেমেয়ের ঘোরতর অমঙ্গল হলো।

পলাশবাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে পৌনে দুটো বেজে গেল। বাস থেকে নেমে দেখি চারপাশ তীব্র কুয়াশায় ঢেকে আছে। রাস্তার পাশে কয়েকটা ফলের দোকানদার টিমটিমে এনার্জি সেভিং বাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। এত রাতে ওদের থেকে কে ফল কিনবে? রাস্তায় দুয়েকজন মানুষ মাফলারে মুখ ঢেকে হাঁটাহাঁটি করছে। সেলিমের কাছ থেকে উত্তরাঞ্চলের শীতের অনেক গল্প শুনেছি। প্রথমবারের মতো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ডিসেম্বরের মাত্র প্রথম সপ্তাহ চলছে, এরমধ্যে জেঁকে বসেছে ঠান্ডা। বগুড়ার হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে নেমেই বুঝেছিলাম শীতের দাপট। বুদ্ধিমানের মতো বাস থেকে নামার আগেই শীতের কাপড় পরে নিয়েছিলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কানটুপি পরে নিলাম ।

যতদূর জানি সেলিমের গ্রামের বাড়ি এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে। এতরাতে ওদিকে যাওয়া সম্ভব না। উটকো ঝামেলা হবে বলে ওর বাড়ির কাউকেও কিছু জানাইনি। নইলে এই মাঝরাতে কাউকে বাসস্ট্যান্ডে এসে থাকতে হতো। আপাতত একটা হোটেলের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাই। রাতটা সেখানেই বসে কাটাতে হবে। সকাল হলে সেলিমের গ্রাম খলেয়ামারী যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যাবে ।

বাজারের এক প্রান্ত থেকে হাঁটা শুরু করে অন্যপ্রান্তে পৌঁছালাম। কিন্তু কোথাও কোনো হোটেল খোলা পেলাম না। কুয়াশায় জবুথবু হয়ে গেছে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো। গাছের পাতায় জমাটবাঁধা শিশির বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মতো টুপটাপ ঝরে পড়ছে। চারপাশে সুনসান নীরবতা। এর মধ্যে হাঁটতে গিয়ে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। হোটেল খোলা না পেলে রাতটা কোথায় কাটাবো, ভোর হতে এখনো অনেক দেরি। এতক্ষণ কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো? নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই ভয় লাগছিল। উপায় না দেখে ফিরে এলাম ফলের দোকানগুলোর সামনে। গায়ে মাথায় চাদর-মাফলার প্যাঁচানো বিক্রেতারা আমাকে কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগলো। দোকান সাজানো কমলা, আপেল ও আঙুর। চাইনিজ কমলা নামের একটা নতুন জিনিস এসেছে বাজারে। সেগুলো নেটের ব্যাগে ভরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বুঝলাম না এই শীতে এরা দোকানে বসে আছে কেন? অনেক যাত্রী যে আসছে তাও না। বাস থেকে কেবল আমিই পলাশবাড়িতে নেমেছিলাম। বিশ মিনিটের মতো হলো এখানে আছি, কিন্তু আর কোনো বাস থামতে দেখিনি। মাঝে মাঝে অবশ্য রংপুরের দিক থেকে কচ্ছপের মতো ধীর

গতিতে কয়েকটা পেট মোটা ট্রাক যেতে দেখেছি। তাছাড়া যানবাহন প্রায় তাহলে এরা বসে আছে কীসের আশায়?

এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ভাই, এখানে কোনো হোটেল খোলা আছে কি? সে জবাব না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। মলিন আলোতেও জ্বলজ্বল করছিল তার দুই চোখ। একটু অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্নটা আবার করলাম। সে কোনো জবাব না দিয়ে পাথরের মতো স্থির চোখে আমাকে দেখতে লাগলো। এরা কী আমার কথা বুঝতে পারছে না? এমন সময় কে যেন আমার কাঁধে হাত দিলো। চমকে পেছন ফিরে দেখি একটা ছোটোখাটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বেশবাস খুব মলিন। ময়লা লুঙ্গি-চাদর পরে আছে। কমলা রঙের মাঙ্কি ক্যাপের জন্য মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। হাতে একটা জ্বলন্ত বিড়ি। সেটাতে সে মাঝে মাঝে কষে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

রংপুরের ভাষার টানে লোকটা বলল, 'হোটেল খোঁজতোছেন তোমরা?

'হ্যাঁ।'

“তাইলে আইসো মোর পাছে পাছে।'

লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলাম। আর উপায় কী? হাঁটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ফলের দোকানদারদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য তৈরি হলো। ওরা একে-অন্যকে ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগলো। মা দুর্গার নাম নিয়ে আমি লোকটাকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। অসম্ভব দ্রুতগতিতে হাঁটতে হাঁটতে সে বাজারের ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছু পিছু গোলকধাঁধার মতো অনেকগুলো গলি পেরোলাম। আমার ধারণা ছিল মফস্বলে বোধহয় গলিটলি খুব একটা থাকে না। কিন্তু এ জায়গাটায় এসে ভুল ভাঙলো। শেষপর্যন্ত আমরা একটা আধপাকা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলে সে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

হোটেলটার অবস্থান আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। জায়গাটা বাজারের একেবারে শেষপ্রান্তে। এতদূরের হোটেলে কে খেতে আসে? তাছাড়া এটা যে হোটেল বোঝারও কোনো উপায় নেই। কোনো সাইনবোর্ড নেই।

লোকটা একবার নক করতেই দরজাটা খুট করে খুলে গেল। ইশারায় সে আমাকে ভেতরে ডাকলো। লোকটার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলাম। আমরা ঢুকতেই কে যেন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ভেতরে কোনো বৈদ্যুতিক বাতি নেই। ম্যানেজারের টেবিলে একটা পুরনো দিনের কুপি টিমটিম করে জ্বলছে। আবছা আলোয় দেখলাম কয়েকটা টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে জনাকয়েক কাস্টমার আমাকে দেখে সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

ঘরের একপ্রান্ত থেকে গমগম করে উঠলো একটা কণ্ঠ, “ছয়জন হইছে মিয়া ভাই।' সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন মোলায়েম গলায় আমাকে স্বাগত জানালো, 'আসুন আসুন। রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' আমি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকালাম ।

ততক্ষণে ঘরের ক্ষীণ আলো চোখে সয়ে গেছে। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একটা মোটাসোটা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। চুল ও চাপদাড়ি মেহেদির রঙে রাঙানো। পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'আমি এই হোটেলের মালিক আওলাদ মিয়া। মালিক কাম ম্যানেজার। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার হোটেলে।'

অন্য কাস্টমাররা সবাই হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সারাজীবন অনেক হোটেলে গিয়েছি-খেয়েছি কিন্তু এভাবে কেউ কখনো আমাকে সম্ভাষণ জানায়নি। আমার পথপ্রদর্শক লোকটাকে উদ্দেশ্য করে আওলাদ মিয়া বলল, 'ফুল মিয়া ভাই, তোমাকে না বলছি মেহমানদের ব্যাগ তুমি নিয়ে আসবে? ওনাকে কষ্ট করতে দিলে কেন?”

ফুল মিয়া কিছু না বলে লজ্জার হাসি হাসলো। আওলাদ মিয়া বলল, 'যাও ওনার ব্যাগটা টেবিলে রেখে আসো।'

সে এগিয়ে আসতেই আমি বললাম, 'না না। তার দরকার হবে না। ব্যাগটা আমার কাছেই থাক।

মুচকি হাসলো আওলাদ মিয়া। দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আপনি আমাদের অতিথি। অতিথির দেখভাল করা আমাদের দায়িত্ব। তাছাড়া আজকে একটা বিশেষ দিন। কিছু কিছু মানুষের আসলে কখনো আক্কেলজ্ঞান হয় না বুঝলেন? পনেরো বছর ধরে ফুল মিয়া এই কাজ করছে। কিন্তু এখনো ঠিক করে একটা কাজ করতে পারে না।'

ভেতর থেকে একজনকে ডেকে সবাইকে চা-মিষ্টি দিতে বলল আওলাদ মিয়া। খেতে খেতে পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলাম। প্রয়াত বন্ধুকে বিদায় দিতে প্রথমবারের মতো উত্তরবঙ্গে এসেছি। মাঝরাতে গন্তব্যে পৌঁছেও গেছি। কিন্তু তারপর থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা মোটাদাগে অস্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গের মানুষ অতিথিপরায়ণ শুনেছি, কিন্তু এই হোটেলে এসে পৌঁছানোর পর থেকে যা ঘটছে তা রীতিমতো বাড়াবাড়ি। আমরা ভেতরে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে চায়ের তলানি গিলে ফেলেছিলাম। থু থু করে সেটা বের করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এত রহস্য ভালো লাগছে না। এখান থেকে বেরোতে হবে। ফুল মিয়া ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললাম, 'এই দরজা খোলো। আমি বাইরে যাব।"

আমার আদেশে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আগের মতোই বাম হাত পেছনে রেখে ডান হাতে বিড়ি টানতে লাগলো। আওলাদ মিয়া কোত্থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো। সে কিছু বলার আগেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলে উঠলো, বাইরে গিয়ে কি করবেন? কই যাবেন? বিপদ আপদের কথা বাদই দিলাম, শীতে জমে মরতে না চাইলে বসে থাকেন। বক্তার দিকে ভালো করে তাকালাম। মধ্যবয়সি

ফুল মিয়া সবাইকে আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেল। আওলাদ মিয়া বলল, “আমরা কেউ কাউকে চিনি না। তবে সবাই ফুল মিয়াকে চেনেন। সেই আপনাদের বাসস্ট্যান্ড থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। আজ আমাদের পরিচয় হবে গল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি মানুষের জীবনের গল্প আলাদা। আজ সেই অভিজ্ঞতা শুনবো সবাই মিলে।’

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হলো। ফিক করে হেসেও দিলাম। বললাম, যদি গল্প না বলতে চাই তাহলে?

আওলাদের মুখের হাসি অমলিন। সে বলল, 'না বলতে চাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনাকে জোর করবো না। তবে গল্পটাকে আমার আতিথেয়তার মূল্য বলতে পারেন।'

‘আতিথেয়তার মূল্য মানে? এটা কী ফাইভ স্টার হোটেল নাকি?”

টেবিলের এক প্রান্ত থেকে এক কিশোর জবাব দিলো, 'ভাইয়া শুনিয়া দেখেন কেচ্ছা। ভালোও তো নাইবার পারে। এত অধৈর্য হইতেছেন ক্যা?

হাল ছেড়ে দিলাম। আমি খুব খুঁতখুঁতে নই। কিন্তু সেলিমের মৃত্যুর কারণে আমার মন ভীষণ বাষ্পরুদ্ধ। এখানকার ঘটনাপ্রবাহও আমাকে কিছুটা বিরক্ত করেছে। মন থেকে সে মেঘ সরিয়ে আওলাদ মিয়াকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনারা শুরু করতে পারেন।'

আওলাদ মিয়া বলল, 'আপনাদের আপত্তি না থাকলে ডান দিক থেকে শুরু হোক।' কারও আপত্তি নেই। সর্বডানে বসেছিলেন এক বৃদ্ধা। তাকে দিয়েই শুরু হলো।

নুরুন নাহারের গল্প

আমার নাম নুরুন নাহার। বয়স কত হইছে কইতে পারি না। তবে পাঁচপান্ন ষাইট হইবার পারে। দ্যাশের বাড়ি, জায়গা-জমি নদীর প্যাডে সান্ধানোর পর বাপের লগে ঢাহা শহরে আইছিলাম। মায়ে আহে নাই। হ্যায় মইরা গ্যাছে আমরারে ছুডু রাইখা। তার কতা আমার ভালো কইরা মনে নাই। মায়ের মুখ মনে না থাকা খুব কষ্ট। যাগো মা আছে খুব সনমান করবেন। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিবেন।

ঢাহায় আওনের পর আমরা তেজগা বস্তিতে উঠছিলাম। আব্বায় তরকারি বেচনের কাম করতো। সক্কালবেলা মাথায় ডালি লইয়া ঘর থাইকা বাইর হইতো। ফিরতে ফিরতে ম্যালা রাইত হইয়া যাইতো। আমি তখনও ছুড, একলা ঘরের কাম করতে পারি না। ভাত রান্ধতে গিয়া পুড়াইয়া ফেলি। ডাইল রান্ধি লবণ ছাড়া। আব্বা আমারে খুব আদর করতো। আমার রান্ধা ভাত-তরকারি খাইতো আর কইতো, খুব ভালো রান্ধছস মা। তোর মা ফেল।'

ছুড হইলেও আমি বেকটি বুজবার পারতাম। বাপের মিছা কথাও ধরবার পারতাম। আমার বাপে মিছা কতা কইবার পারতো না। কইলে তার চউখের পাতা বেশি টিপটিপ করতো। বাপে ধরা খায়া যাইতো। আমগো বাপ মাইয়ার সংসার বেশিদিন টিকে নাই। একদিন তরকারি বেইচা ফিরনের টাইমে বাপে কাওরান বাজারে ট্রেনে কাটা পড়লো ।

আমার তখন দুনিয়া আন্ধার অবস্থা। আমার এক খালু আছিল বস্তিতে। শমসের মিয়া নাম। হ্যায় আমারে এক বাইত্তে কামে লাগায়া দিলো। যে বাইত্তে গেলাম হ্যারা বিশাল বড়লোক। ভালোই আছিলাম অইহানে। ভালো খাইতে দিত। ঈদে-পরবে জামা-কাপড়ও দিত।

অগো অইখানে গিয়া যেইটা সবচেয়ে ভালো লাগছে তা হইলো অগো কুত্তা। ইয়া বিশাল, ধামড়া একটা বিদেশি কুত্তা আছিলো তাগো। শুরুতে শুরুতে খুব ভয় পাইতাম। আমার কমরের সমান উঁচু। এত বড় কুত্তা তো আগে দেহি নাই। আমগো দেশে রাস্তায় যে লালু-ভুলু-কালু কুত্তা দেহা যায় অরা তো অত বড় হয়

না। আস্তে আস্তে কুত্তার লগে আমার খুব দোস্তি হইলো। নাম আছিলো জিমি। সাহেবের মতোন নাম। সাহেবের মতোন মিজাজ। আমি অরে খাইতে দিতাম বইলা আস্তে আস্তে খুব মিলমিশ হইয়া গেছিলো।

কিন্তু আমার কপালডাই পুড়া। বেশিদিন সুখ সইজ্য হয় না। একদিন হইলো কী, আমি খাবার দেওয়ার এট্টু পর জিমি কাতলা মাছের মতোন তড়পানি শুরু করলো। স্যারে-ম্যাডামে তো ঘটনা দেইখা কাইন্দা-কাইটা অস্থির। টেলিফোনে কারে কারে জানি ডাক দিলো কুত্তাডারে হাসপাতালে নেওনের লাইগা। কিন্তু লাভ হয় নাই। জিমি মইরা গেল। পরে বাইর হইলো জিমির খাওনে কেডা জানি র‍্যাটুম মিশায়া দিছিল।

র‍্যাটুম বুজেন? ইন্দুর মারা বিষ। আমি খাওন দিতাম বইলা দোষ হইলো আমার। কিন্তু বিশ্বাস করেন, আল্লার কিরা, আমার মরা মায়ের কসম এই কাম আমি করি নাই। তারারে এইডা কে বুঝাইব? তারা কিন্তু মানি লোক আছিল। আমারে মাইরধোর করে নাই। খালি কইছে, তুমি কাইল সকালে এই বাসা থাইকা চইলা যাবা। তোমার খালুরে খবর দিতাছি আইসা লইয়া যাইব। আমি বাইর হইয়া গেলাম পরের দিন। এরপর থাইকা আমার খুব কুত্তা পোষার নেশায় ধরলো।

খালু আমারে আইনা এক রিকশাওয়ালার লগে বিয়া দিলো। আপনাগো রংপুরের মানুষ। লোকটা সরল সোজা আছিল। কিন্তু দোষ ছাড়া কী আর পুরুষ মানুষ অয়? হ্যার আছিল জুয়া খেলার নেশা। মান্ডার রুস্তম ওস্তাদের রিকশা চালাইতো। সারদিন যা কামাই করতো, গ্যারেজে জুয়া খেলা উড়াইতো। আমি কত নিষেদ করছি, হুনে নাই। মাঝে মাঝে আমারে মারত। গাল-মুখ ফায়ে ফেলত মাইরা। কিন্তু রাগ পইরা গেলে আমারে জড়ায়া ধইরা কানতো।

পাঁচ বছর কুন দিক দিয়া কাইটা গেল ট্যার পাই নাই। ততদিনে আমাগো কুনো বাচ্চা-কাচ্চা হয় নাই। আশেপাশের মানুষ নানা কুকতা কয়। তার-আমার অবশ্য তাতে কিছু যাইত-আইতো না। আমি এট্টা কুত্তা পালতাম। নাম দিছিলাম টাইগার। মানুষটা কামে বাইরে গেলে ঘরের কাম আর কুত্তা নিয়া আমার টাইম ভালোই যাইতো।

কিন্তু সুখ আমার লাইগা না। একদিন শুক্কুরবার বিকালে খাওয়া-দাওয়া সাইরা গেছিলাম আনসার মোল্লার বাড়ি। হ্যার বউয়ের লগে আমার ভাবি ননদ সম্পর্ক আছিল। মাঝে মইদ্যে ছুডখাট কাম কইরা দিতাম। সেইদিন গেছিলাম টিপিতে বই দেখনের লাইগা। রাজ্জাক-শাবানার একটা বই চলছিল। শাবানার দুঃখ দেইখা

আমার দুই চোখ দিয়া পানি আহে আহে অবস্থা। এমুন সময় পাশের বাড়ির সাদ্দামের মা আইসা কয়, 'হারামজাদী এইহানে বয়া রঙ্গ করস। অইদিকে দ্যাখ, তোর ভাতাররে কিডা জানি চাক্কু মাইরা দিছে।'

আমি হায় হায় কইরা বাইরে আয়া পরলাম। জুয়ার আসর থেইকা তারে ততক্ষণে হাসপাতালে লইয়া গেছে। মজিদ মিয়ার রিকশায় কইরা হাসপাতাল গিয়া দেহি হ্যায় আর নাই। আমি পাথরের লাহান জইমা গেলাম। আল্লাহ, এইডা কেমুন পরীক্ষা লইছ তুমি? মরদরে ছাড়া অহন বাঁচুম কমনে?

প্রথমে ভাবছিলাম আমি আর বাঁচুম না। সোয়ামী যেইহানে গেছে আমিও চইলা যামু। কিন্তু আল্লাহ কারো জন্য কিছু থামায়া রাখে না। আমি বাইত্তে বাইত্তে ছুডা বুয়ার কাম শুরু করলাম। সারাদিন কাম করি আর রাইতে টাইগাররে লয়া ঘরে ঘুমাই। বালিশের তলে একটা বড় রামদাও রাখি। বস্তির পুঙ্গির পোলারা ভাতারের মরণের পর ম্যালা দিস্টাপ দিছে। কইছিলাম না, আমার কপালে সুখ নাই। যে মাইয়া জন্ম নিতে গিয়া মায়েরে মাইরা ফালায় তার কপালে সুখ থাকে ক্যামনে? কয়দিনের জ্বরের পর আমার ডাইন পাও ফুইলা ঢুল হইয়া গেল। ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। কয় গোদ রোগ হইছে। পয়সাপাতি ম্যালা খরচ করছি। অনেক কবিরাজ, ঝাড়ফুক করছি। কিন্তু কাম হয় নাই ।

শ্যাষ পর্যন্ত প্যাটের দায়ে ভিক্ষা করা শুরু করলাম কাওরান বাজারে। হাঁটু পর্যন্তশাড়ি তুইলা বইতাম বাজারের এক কোনায়। কেউ ট্যাকা দিত, কেউ ছ্যাব ফালাইত, কেউ গাইল পারত। আপনেগো দোয়ায় আয় রোজগার মন্দ হইতো না। এইভাবে আল্লার রহমতে দিন ভালোই কাটতাছিল। টাইগার তহনো আমারে ছাড়ে নাই। আমি ভিক্ষা করতে বাইর অইলে আমার লগে যায়। চুপ কইরা বইসা ভিক্ষার গান হুনে। ভাত বনরুটি-চা সব আমরা ভাগাভাগি কইরা খাই। দুনিয়ার মানুষ আমার পাও দেইখা ঘিন্না করলেও কুত্তাড়া কুনদিন করে নাই। আমারও অর ব্যাপারে কুনো ঘিনপিত আছিল না।

এমনে কইরা ভালোই আছিলাম আমরা। ট্যাকা-পয়সা জমানো শুরু করছিলাম। কয়েক বছর এমনে কাইটা গেল। টাইগার তখন এট্টু বুড়া হইছে গায়ের পশম খইসা যাইতেছিল। বাজারের কুত্তাগো লগে আগের মতোন আর ফাইট দিবার পারত না। কুনো কুত্তা অর লগে কাইজা জুইড়া দিলে আমি লাঠি লয়া হুশহাশ কইরা খেদায়া দিতাম। পেত্যেকদিন মালেক মিয়ার দোকান থাইকা এক গ্লাস দুধ কিন্যা দুইজনে ভাগ কইরা খাইতাম। আমি আছিলাম অর মায়ের মতোন। কিন্তু

এরপরই আইলো আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। আপনাগো যে গল্প শুনাবার লাইগা এতগুটি প্যাচাল পাড়লাম।

বাজারের যে কোনে আমি বইতাম সেহানে আইয়া হাজির হইলো এক ছেমড়া। নাম আব্বাস। ২৪/২৫ বছর বয়স হইবো। আগে বাসের হেলপার আছিলো। আর একটা পাও আছিল না। একবার চাকার তলে পইড়া কাইটা ফেলা লাগছিল। হ্যায় আইসা আমারে কয়, ‘চাচী এই সাইডে তো তুমি ছাড়া কেউ বহে না। তুমার সাইডে যদি এই বসি তাইলে রাগ করবা?” আমি কইলাম, ‘ছেমড়া তুই কাম কইরা খাইতে পারস না? তোরে কে ভিক্ষা দিব?”

হ্যায় হাইসা কয়, ‘এক পাও নিয়া কি কাম করুম? কেডা কাম দিব? চিন্তা কইরো না বেশিদিন বমু না। কয়টা ট্যাকা হইলে এট্টা নকল পাও লাগায়া লমু। তারপর আবার বাসে কাম করুম। এইবার হমু ডিরাইবার।' আমি অরে বইতে দিতে চাইলাম না। একলা থাকলে সুবিধা। বেশি মানুষ থাকলে ব্যবসার দিস্টাপ হয়। কিন্তু পরে অই অ্যালাকার নেতা জুম্মন মিয়ার পোলাপাইন আমারে আইসা কয়, “তুই আর বইতে দেস নাই ক্যান? হ্যায় যে জুম্মন ভাইয়ের ভাইগ্না লাগে হেইডা জানস? কাইল থাইকা পোলা এইহানে বইবো। যুদি চিকুর পারস তাইলে হাত-পা বাইন্ধা রেললাইনে ফালায়া আমু।'

পরের দিন থাইকা হ্যায় বওয়া শুরু করলো। আমি পত্তম পত্তম কুনো কথা কইতাম না। অরে পাত্তা দিতাম না। হ্যায় হ্যার মতো ভিক্ষা কইরা চইলা যাইতো, আমি আমার মতো। আমার কাছে পাত্তা না পাইয়া হ্যায় টাইগারের সঙ্গে মিল কইরা নিছিল। মাঝে মইদ্যে ডাইকা কেক-বনরুটি খাওয়াইতো। টাইগারও অর পোষ হইয়া গেছিল। দেখলেই খুশি হয়। ল্যাঞ্জা নাড়াইতে নাড়াইতে আগায়া যায়। আমিও অগো দুইজনের খেলা দেহি। কিছু কই না।

এমন কইরা আব্বাসে টাইগাররে দিয়া আমার মন নরম কইরা ফালাইলো। মাঝে মইদ্যে ক্যাচে ভর দিয়া ল্যাংড়াইতে ল্যাংড়াইতে আমার সাইডে আইসা বইসা থাকে৷ টুকটাক গপ্পো করে। ব্যাড়ায় এমন কইরা কতা কইতো যে না গইলা গিয়া পারি নাই। ভিক্ষার পয়সায় দুপুরে খাইয়া আড়তের পিছে দুইজনে জিরাইতে বইতাম। গোদা-গাবদা পাও লইয়া তহন আমার হাঁটতে কষ্ট হয়। আর আব্বাসের তো ঠ্যাংই নাই। দুইজনে যহন হাইট্টা যাইতাম, মাইনষে আমগোরে দেহায়া কইতো, 'অই দ্যাখ ল্যাংড়া লেংড়ি যাইতাছে।' পোলাপাইনে ছড়া কাটতো, 'কানা খোড়া ভ্যাংড়া/ তিন হারামির ল্যাংড়া।'

জিরাইতে জিরাইতে আমরা অনেক সুখ-দুঃখের কতা কইতাম। আব্বাস যেমুন তার কিচ্ছা কইতো, আমিও আমারডা কইতাম। তহনও আমার যৌবন যায় নাই। জুয়ান আছিলাম। আব্বাসের গপ্পো হুনতে হুনতে তারে ভালো লাগা শুরু করলো। হউক না ব্যাডায় দশ বছরের ছুড। মাইনষের কতায় পাত্তা দেওয়ার মানুষ আমি জীবনেও আছিলাম না। ধীরে ধীরে হ্যায় আমার মন দখল কইরা নেওয়া শুরু করলো। ভাব-ভঙ্গি দেইখা বুজতাম হ্যায়ও আমারে পছন্দ করে। মাঝে মইদ্যে আমারে সুনো-পাউডার লিবিস্টিক কিন্যা দিত। চুড়ি আইনা কইতো, ‘পরো। তুমি সাইজা-গুইজা আহহ আমি তুমারে দেহি। '

আমি কইতাম, ‘ধরো ছ্যামড়া! আমার কি সাজন-গুজনের বয়স আছেনি? সোয়ামী মইরা গ্যাছে সেই কবে। আমারে সাজতে দ্যাকলে মাইনষে কি কইব?'

হ্যায় কইতো, ‘মাইনষেরে ভয় পাও নাকি? তাগো আমরা খাই না পরি? আয়নাডা বাইর কইরা দেহ তো কি সুন্দর লাগতাছে তুমারে।'

এমনে কইরা আমাগো মনের মিতালি হইলো। ভিক্ষা করুম কি, হারাদিন আব্বাস আমার দিকে আর আমি আব্বাসের দিকে চাইয়া থাকতাম। দুইজন দুইজনের ছালায় বইসা সুখ-দুখের আলাপ করতাম। আমি আমার কতা কইতাম। হ্যায় হ্যারটা কইতো। কইতো মা-বাপ থাইকাও কেমনে নাই হয়া গেছে। কেমনে সে মাইনষের লাথি-উষ্টা খাইয়া বড় হইছে। কিচ্ছু বাদ দেয় নাই। কইছে কেমনে হ্যায় চায়ের দুকানের টাকা চুরি কইরা বংশাল থাইকা পলাইছে। বিশ টাহার লাইগা পল্টনের মিটিংয়ে ক্যামনে ককটেল ফুডাইছে। গাড়ির কাম যহন শুরু করলো তহন অর ওস্তাদ আছিলো শামসুল ডিরাইবার।

হেই ব্যাডায় ডিরাইবারি শিখানোর নাম কইরা ক্যামনে পুটকি মারার তাল করছে। হ্যারপর বড় হইয়া হ্যায় ক্যামনে শামসুলরে শায়েস্তা করছে এইসব কইতো আমারে ।

এমনি কইরা আমরা দুইজনে দুইজনের খুব কাছে চইলা আইলাম। হ্যায়, টাইগার আর আমি মিল্যা খুব সুখে আছিলাম ।

একদিন রাইতে দুয়ারে খিল দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়ছি। হঠাৎ হুনি কেডা জানি দরজা ধাক্কাইতাছে। হেইদিন খুব ঝড়-তুফান হইতাছিল। আমি তো ডরে অস্থির। ভাবছি চুর আইছে। টাইগারও ঘেউ ঘেউ শুরু করছে। রাম দাওড়া হাতে লইয়া দরজা খুইলা দেহি আব্বাস। ভিজ্যা এক্কেরে শেষ। তাড়াতাড়ি অরে ঘরে ঢুকাইয়া দরজা লাগায়া দিলাম। এট্টা গামছা দিছে কি দেই না আব্বাসে আমারে জড়ায়া

ধরলো। কতদিন মরদ মাইনষে আমারে অমনে ধরে না। খালি দুর দুর ছাই ছাই করে। আমি আরে আটকাইলাম না। যা হইতাছে হউক।

আমার কতা হুইনা আপনেরা আমারে খারাপ মাইয়া মানুষ মনে করলেন তো? আল্লার কাছে কই আমার মতোন কপাল য্যান আপনাগো না হয়। এমন কইরা কতক্ষণ কাইটা গেছে জানি না। বিয়ান হওনের আগেই আব্বাস যাওনের লাইগা উইঠা গেল। আমি কইলাম, আমারে দেইখা তুমার ঘিনপিত জাগে না ?”

হ্যায় কইলো, কেন জাগবো?

কইলাম, এই পাওডা দেইখা ছ্যাব ফেলবার মন চায় না? হ্যায় হাসতে হাসতে কয়, ‘তুমার তাও পাও আছে। আমার তো তাও নাই।'

আমি দুকু কইরা কইলাম, 'ইস, আমার যদি পাওডা ভালো থাকতো?'

হ্যায় কয়, ‘পাও ভালো থাকতে তুমি আমারে পাত্তা দিতা? খেদায়া দিতা না? আচ্ছা, তুমি কী চাও তুমার পাড়া ভালা হইয়া যাউক ?

আমি কইলাম, এইডা চামু না! কী কও তুমি? আল্লার কাছে কত কই আমার পাওডা ভালো কইরা দাও। পাঁচ-ওয়াক্ত নমাজ ধরুম। মসজিদে পেত্তেক শুক্কুরবার টাহা দিমু। কিন্তু আল্লায় তো হুনে না।'

আব্বাসে কয়, 'আচ্ছা। আমি তাইলে তুমার চিকিৎসা করুম। হাসতাছ যে? আমারে কি তুমার ডাক্তর মনে হয় না? আমি কিন্তু কইলাম ফকিরি বংশের পোলা

।

পরের দিন রাইতে আব্বাস আবার আইলো আমার ঘরে। আইসা কয়, ‘শুন এট্টা ভালো খবর আছে। তুমার রোগের এটা চিকিৎসা পাইছি।' আমি কইলাম, ‘কই পাইলা? স্বপ্নে পাইছোনি? তুমাগো তো আবার ফকিরি বংশ।'

হ্যায় কয়, ‘ইস অত পাক-পবিত্র যদি হইতে পারতাম! হারা রাইত তো কাইটা যায় তুমার খোয়াব দেইখা। '

আমি শরমে মরি। কইলাম, “তাইলে?”

হ্যায় কয়, ‘গুদারাঘাটের মন্তা কবিরাজের কাছে গেছিলাম। ব্যাডার হাত পাও ধইরা এট্টা অমুদ লইছি। তবে এইহানে এট্টা কাহিনি আছে। খালি অমুদ খাইলে হইবো না। এট্টা ছদকা দেওন লাগবে। দিলে এক রাইতের মইদ্যে তুমি ভালা হইয়া যাইবা।'

আমি কইলাম, ছদকা দেওনের পয়সা পামু কই? আর পাও ভালো হইলে ভিক্ষা ক্যামনে করুম?

আব্বাস কয়, ‘ভিক্ষা ক্যান করবা? সাবগো বাইতে কাম করবা। গারমেনসে কাম করবা। আমার রানি হইয়া থাকবা। তবে পাও ভালো হইলে আবার আরেক টেনশন। ‘টেনশন কিয়ের?' ‘আমার মতোন ল্যাংড়ারে কি আর তহন মনে রাখবা? আমি কইলাম, একবার আমারে ভালো কইরা দেও। তুমারে আমি দিলের মইদ্যে গাঁইথা রাখুম।

হেরপর আব্বাস আমারে কয়টা বড়ি দিলো। কইলো, কবিরাজে কইছে, ফজরের নমাজ পইরা সাত কদম হাঁটতে। হাঁইটা পশ্চিম দিকে মুখ কইরা সাতবার কুলহু আল্লাহ সূরা পড়বা। হ্যার পর সাত কদম হাঁইটা আগের জায়গায় ফিরত আইবা। আইসা পানি দিয়া বড়িডা গিল্যা ফেলব। হ্যারপর ডাইন পাওয়ে সাতবার ফুক দিয়া শুইয়া পড়বা। সাতদিন পর ছদকা দেওন লাগবো।'

এমনে কইরা সাত দিন কাইটা গেল। আমি সাতড়া বড়ি খাইলাম। পাওডাও এই ভালো ভালো ঠেকে। মনে জোর পাই। আট দিনের দিন ফজরের ওয়াক্তের আগে আব্বাস আইসা হাজির। কয়, শুন, কবিরাজের কাছে গেছিলাম। হ্যায় কইছে আজকেই সদকা দেওন লাগবো।'

আমি কইলাম, 'কি সদকা দিমু? টাহা পয়সা কিছু জমাইছিলাম। কিন্তু অত টাহা কি আর আছে?'

হ্যারে এট্টু চিন্তিত দেখলাম। কইলো, 'টাহা পয়সা লাগবে না কুনো। কিন্তু তুমার খুব পছন্দের এট্টা জিনিস ত্যাগ করন লাগবো। বিষয়ডা ক্যামনে তুমারে কই বুঝতাছি না।'

কইলাম, 'দেহ, খুব আশা কইরা আছি পাওডা ভালো হইয়া যাইব। আবার দুই পায়ে ভর দিয়া সুজা হইয়া হাঁটতে পারুম। আবার পাওয়ে আলতা পরুম। তুমি বিষয়ডা খুইল্যা কও।

আব্বাস কইলো, "আইচ্ছা শুনো। কবিরাজ সাবে কইছে এট্টা কুত্তার প্যাড কাইটা তুমার পাওডা সান্ধায়া দেওনা লাগবে। আমি কইকি, তুমি টাইগাররে সদকা দিয়া ফালাও।'

আমার মাথায় মনে হইলো ঠাডা পড়ছে। আমার টাইগার! কত সুখ দুক্ষের সাথি আমার! কত বছর ধইরা তারে পালতাছি। হ্যায় তো আর কুত্তা নাই, আমার পোলা হইয়া গেছে। অর গায়ে কুনোদিন হাত পর্যন্ত দেই নাই। আর সেই টাইগারের প্যাড কাটুম আমার পায়ের গোদ সারাইতে? চিকুর পাইড়া কইলাম, ‘যা কইছো, কইছো। টাইগারের গায়ে আমি হাত দিতে দিমু না।'

আব্বাস কইলো, ‘শুনো, বিষয়ডা কি আমিও ভাইবা দেখি নাই? কিন্তু। এইডা মন্তা কবিরাজের নির্দেশ। টাইগাররেই সদকা দেওন লাগব। আমার তহন কান্দন চইলা আসছে। ঘরের এক কোনে কুত্তাড়া গোল হইয়া হুইয়া আছে। দেইখা কি যে মায়া লাগলো! কানতে কানতে কইলাম, 'আমার যে কুত্তা আছে হেইডা অই ব্যাডায় জানলো ক্যামনে?” আব্বাস কইলো, ‘আমি কইছি। রুগির ইতিহাস খুইলা কওন লাগে। তাছাড়া মন্তা কবিরাজের গায়েবী ক্ষমতা আছে। হ্যায় এইগুলা ক্যামতে ক্যামতে জাইনা যায়।

'জীবন গেলেও আমি এইডা করতে পারুম না। আমার পাও সারার দরকার নাই।'

আব্বাস তহন আমার কাছে আইসা বসলো। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কইলো, ‘দেহ এট্টা কতা আছে। ভাবছিলাম তুমারে কমু না। কিন্তু তুমি যেমুন করতাছ না কইয়া পারছি না।'

আদর পাইয়া আমি তহন আরো জোরে জোরে কানতে শুরু করছি। কইলাম, কি কতা?

হ্যায় কইলো, তমার গোদ রোগ ক্যামনে হইছে জানো? মন্তা কবিরাজ হিসাব কইরা দেখছে। এই কুত্তার বদ নজর থাইকাই অসুখ হইছে।

আমি এক্কেরে চুপ হইয়া গেলাম। কতাডা আগেও বস্তির কয়জনে কইছে। আমি পাত্তা দেই নাই। কিন্তু সত্য সত্যও তো হইবার পারে। কুকুর থাইকা মানুষের কত রোগ হয়। জলাতঙ্ক হইয়া মানুষ পানি পানি কইরা চিক্কুর পাইড়া মরে। কিন্তু আমি তো অরে পালছি। আমারে খারাপ নজর দিবে ক্যান কুত্তাডা?

আব্বাস ততক্ষণে বুইঝা ফালাইছে যে আমার মন নরম হইছে। হ্যায় কইলো, 'তুমি চিন্তা কইরো না। আমি আরো কুত্তা লইয়া আমু পুষনের লাইগা। '

আমার মনের মইদ্য তহন যুদ্ধ চলছিল। একদিকে আমার এত আদরের কুত্তা, অন্যদিকে আমার পাও ভালো হওনের লোভ। পাও আবার স্বাভাবিক হইব, আবার হাঁটতে পারুম চিন্তা করতেই মনডা শান্তিতে ভইরা গেল। এই গোদা পাওয়ের লাইয়া মানুষ আমারে দেইখা ছ্যাব ফালায়। গাইল পারে। সাইরা উঠলে কেউ আর ছিঃ-ছা করবো না। আব্বাসরে লইয়া নতুন জীবন শুরু করবার পারুম

শ্যাষ পর্যন্ত জিত হইলো লোভের। আমি কানতে কানতে আব্বাসরে কইলাম, 'তুমি যেইডা ভালো বুঝ করো ।

আব্বাস আমার কপালে এট্টা চুমা খাইয়া কইলো, 'টাইগাররে তাইলে বাইন্ধা ফালাই। ঘরে ছুরি-চাকু কিছু আছে?”

আমি মুখে কিছু কইলাম না। আস্তে আস্তে মাথা লাড়াইলাম। আব্বাস কইলো, ‘তুমারে কিছু করন লাগবোনা। খালি অইগুলা কই আছে দেহায়া দাও।'

আমি কানতে কানতে দেখায় দিলাম। হ্যায় আমার তরকারি কাটার ছুরিডা বাইর কইরা নিল। অর হাতে দেহি কি, এট্টা ছালা আর একগাছা দড়ি। ব্যাডায় আগে থেইকা রেডি হইয়া আইছে। হ্যায় টাইগারের দিকে আউগাইয়া যাওন শুরু করলো। আমি কানতে কানতে তহন অস্থির।

চৌকিতে পইড়া মাথাডা বালিশের তলে ঢুকায়া দিলাম। এরপর কি হইছে আমি দেহি নাই। আমার মনের ভিতর ঝড়-তুফান চলছিল। একদিকে কানতেছিলাম আমার টাইগারের লাইগা, অন্যদিকে কেমন জানি এট্টু খুশিও লাগতেছিল। আইজ আমার পায়ের গোদ ভালো হইয়া যাবে। আবার ভালো কইরা হাঁটতে পারুম। যে বান্দির পোলারা আমারে দেইখা ছ্যাব ফালাইছে, তাগোরে দেহায়া দেহায়া হাঁটুম। এট্টুপর টাইগারের কান্দনে আমার খোয়াব ছুইটা গেল। কেউ কেউ কইরা সে এমন কান্দন যে আমি শুয়া থাকতে পারলাম না। লাফ দিয়া গেলাম আব্বাসরে থামাইতে। আমার পাও ভালো হওয়ার দরকার নাই। আমার টাইগাররে চাই।

কিন্তু ততক্ষণে ঘটনা ঘইটা গেছে। কাছে গিয়া দেহি টাইগারের প্যাট কাইট্টালাইছে আব্বাসে। আমি মাটিতে পইড়া কানতে লাগলো। আব্বাস আইসা আমার মুখ চাইপা ধরলো। কইলো, চুপ! পাড়াপতিবেশি জাইগা যাইবো

টাইগাররে দেইখা বুকটা ফাইট্টা গেল। দুই পাও বান্ধা। মাথাডা এট্টা ছালার ভিতরে ডুকানো। বুক থাইকা প্যাট পর্যন্ত জায়গা চিরা। রক্তে ভাইসা গেছে ঘরের মেঝে। নাড়ি-ভুড়ি বাইরে আয়া পড়ছে। সিনারি আমি জীবনেও ভুলুম না।

আব্বাস আমারে কইলো, 'হপায় কাম সারন লাগবো। অহনো জিন্দা আছে। মইরা গেলে কাম হইবো না।'

আমারে কিছু কওনের সুযুগ না দিয়া হ্যায় আমার গোদওয়ালা ডান পাওটা ধইরা টাইগারের কাটা প্যাডে সান্ধায়া দিলো। পাওয়ে নরম নরম ঠেকল। তারপর আর কইতে পারি না। অজ্ঞান হইয়া গেলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান আছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরতেই মনে আইলো টাইগারের কতা। মেঝেতে চাইয়া দেহি কিছু নাই। সব ফকফকা।

আব্বাস কইলো, ‘চিন্তা কইরো না। আমি সব পরিষ্কার কইরা ফালাইছি।'

লগে লগে মনে পড়লো পাওয়ের কতা। দেহি আমার আর গোদ নাই। পাও এক্কেরে আগের মতোন স্বাভাবিক।

আমারে উইঠা বসতে দেইখা আব্বাস কইলো, 'সইষ্যার ত্যালের বুতলডা কই রাখছো? মন্তা কবিরাজে কইছে পাওডা ভালো কইরা মালিশ করতে। '

***

বৃদ্ধা থামলো। আমরা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনছিলাম। শেষ হওয়া মাত্র আমাদের যেন ঘোর ভাঙলো। সবাই একসঙ্গে তাকালাম তার পায়ের দিকে। কুপির আলোতে ভালো করে পাটা দেখা যাচ্ছিলো না। টেবিলের একমাত্র কিশোর সদস্য অতি উৎসাহে কুপিটা পায়ের কাছে নিয়ে গেল।

বৃদ্ধাও দর্শকদের সুবিধার্থে শাড়ি গুটিয়ে খানিকটা পা দেখিয়ে দিলেন। শীর্ণ, স্বাভাবিক পা। গোড়ালির পেছন দিকে কুৎসিত কিছু ফাটা দাগ ছাড়া অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নেই ।

বিষয়টা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাওয়ার আগেই আওলাদ মিয়া বাধা দিলো। বলল, ‘আমরা এখানে থামি। চলুন পরের গল্পটা শোনা যাক।

বৃদ্ধার পর বসে ছিলেন সেই ভদ্রলোক যাকে দেখলে স্কুল মাস্টার মনে হয়। তিনি কিছুক্ষণ খুক খুক করে কাশলেন। তারপর আওলাদ মিয়াকে বললেন, ‘একটা

লাল চা খাওয়াতে পারবেন?' আওলাদ মিয়া কিছু বলার আগেই ফুল মিয়া গেল চা আনতে।

ভদ্রলোক গল্প বলতে শুরু করলেন।

সুধাংশু গুপ্তের গল্প

আমার নাম সুধাংশু গুপ্ত। বয়স পঁয়ষট্টি। আমার বাবা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। আমি তার একমাত্র সন্তান। এখন যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি তা সরাসরি আমার নয়। বরং আমার এক বিখ্যাত পূর্বপুরুষের। শুনতে গল্পের মতো মনে হলেও এটা আমি বিশ্বাস করি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এ নিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। চাইলে গল্পটা বাইরে বলতে পারেন কিন্তু আমার নাম-ঠিকানা বদলে নিলে খুশি হবো।

আমার আদিনিবাস বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ায়। আমার বাবা সেখান থেকে রংপুর শহরে চলে আসেন। কবে, কী অবস্থায় এসেছিলেন আমি ঠিক জানি না। তবে এরপর সারাজীবন যে আগৈলঝাড়ায় একবারও যাননি সেটা নিশ্চিত বলতে পারি।

জন্মস্থানে না ফিরলেও জায়গাটাকে কখনো ভুলতে পারেননি। ছোটবেলায় বাবা আমাকে যেসব গল্প শোনাতেন তার মধ্যে আগৈলঝাড়ার গল্পই ছিল বেশি। আমাদের রংপুর শহরে বড় কোনো নদী নেই। সবেধন নীলমনি যে নদীটা আছে তা হলো ঘাঘট। তিস্তা আছে বটে, তবে শহর থেকে সেটা বেশ দূরে। বাবার কাছে আগৈলঝাড়ার, বিশেষ করে বড় বড় নদীর গল্প শুনলে আমার বেশ রোমাঞ্চ হতো।

আগৈলঝাড়ায় একটা নদী আছে। নাম 'পয়সার হাট,' এখন তার কী অবস্থা জানি না। কিন্তু বাবার ছোটবেলায় এই নদী দিয়ে বড় বড় লঞ্চ যেত। বাবা ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিল। কোমরের ধুতি গলায় প্যাঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো নদীতে। সাঁতরে লঞ্চে উঠে চলে যেত দূর-দূরান্তে। এই নিয়ে আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমা অনেক বকাবকি করতেন। তাতে অবশ্য বাবার দুরন্তপনা কমতো না। চিরকালই বাবা

বাঁধাধরা জীবনকে এড়িয়ে চলেছেন। ছোটবেলায় বোধহয় ব্যাপারটা আরো বেশি ছিল। আগৈলঝাড়ার যে গ্রামে আমাদের আদিনিবাস তার নাম গৈলা। আপনাদের মধ্যে বাংলার কোনো ছাত্র থাকলে জায়গাটার নাম হয়তো শুনে থাকবেন। এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল ফুল্লশ্রী। এ গ্রামেই জন্মেছিলেন কবি বিজয় গুপ্ত। 'পদ্মাপুরাণ' নামের মনসামঙ্গল কাব্য লিখে যিনি অমর হয়ে আছেন। আমি তার বংশধর।

যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটি আমার এই কৃতি পূর্বপুরুষের। আপনারা হয়তো দেবী মনসার কথা শুনে থাকবেন। তিনি সাপের দেবী। আপনারা যাঁরা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি জানেন তারা মনসাকে ভালো চিনবেন। ইনিই চম্পক নগরের বণিক চাঁদ সওদাগরকে বারবার হেনস্তা করেছিলেন। পূজা দিতে রাজি না হওয়ায় ফুলশয্যার রাতে সাপ পাঠিয়ে চাঁদের ছেলে লখিন্দরের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলেন।

এই মনসার তুষ্টির জন্য মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বিজয় গুপ্ত। তার সম্পর্কে আসলে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কিছু কিংবদন্তি মানুষের মুখে বেঁচে আছে। আমাদের পরিবারে একটা গল্প অবশ্য প্রচলিত আছে। সেটাই আপনাদের বলছি।

বিজয় ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে। তার বাবা সনাতন ছিলেন গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন ফতে শাহের গোমস্তা বা রাজস্ব সংগ্রাহক। একমাত্র সন্তান হওয়ায় বিজয় ছিলেন বাবা-মায়ের নয়নের মণি। কিন্তু বেশি আদর পেলে যা হয়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছন্নে যাওয়া শুরু করেন। মাদক ও নারীর নেশায় জড়িয়ে পড়েন। বাবা-মার তখন দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই। ছেলেকে শুধরানোর অনেক চেষ্টা করলেন তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষমেশ উপায় অন্তর না দেখে ছেলের বিয়ে ঠিক করেন।

যুগে যুগে বাঙালি অভিভাবক এটাকেই শেষ অস্ত্র হিসেবে দেখে এসেছেন। বিজয়ের বয়স তখন ষোলো। এ বয়সেই বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছেন। বাবা-মায়ের পছন্দের পাত্রিকে বিয়ে করতে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। ততদিনে তার মন হরণ করেছে এক মুসলমান রমণী। রমণীটি ছিলেন ফতেহাবাদের এক

নর্তকী। উত্তর ভারতের কোনো জায়গা থেকে বাংলায় এসেছিলেন। বিজয় বাবার কাছে গোঁ ধরলেন, বিয়ে করলে এই মেয়েটিকেই করবেন।

ছেলেকে কোনোভাবেই শান্ত করতে না পেরে বাবা ভীষণ বিরক্ত হলেন। একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্য করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। নিরুপায় বিজয় চলে গেলেন সেই নারীর কাছে। কিন্তু ফতেহাবাদ পৌঁছে দেখেন সে নারী আর বেঁচে নেই। সাপের কামড়ে মারা গেছে। একদিকে বাবা-মা অন্যদিকে প্রেমিকাকে হারিয়ে বিজয় দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

তখন বিক্রমপুরের দিকে ছিল ঘন জঙ্গল। ভীষণ শ্বাপদসংকুল সে বন। মনের দুঃখে বিজয় ভাবলেন আর সংসারেই থাকবেন না। সে বনে গিয়ে সাধনা করবেন যেন দেবী মনসা অন্তত তার প্রেমিকাকে ফিরিয়ে দেয়। বেহুলার চেষ্টায় তো লখিন্দর ফিরে এসেছিলেন। একইভাবে তার প্রেমিকাও তো ফিরে আসতে পারে।

বিক্রমপুরে গিয়ে প্রথমদিনেই তার বিশ্রী অভিজ্ঞতা হলো। ছোটবেলা থেকে বিজয় ভীষণ প্রাচুর্যে বড় হয়েছেন। অরণ্যের আদিম জীবন তার ভালো লাগবে কেন? ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত হয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন একটা প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছের নিচে। সেখানেই স্বপ্নে দেখলেন মা মনসাকে

মনসা তাকে আদেশ করলেন কবিতা রচনা করতে। এমন কিছু লিখতে যা যুগে যুগে দেবীকে অমর করে রাখবে। তাহলে দেবী বিজয়ের মনের আশা পূরণের ব্যাপারে ভেবে দেখবেন। খুব আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙলো বিজয়ের। মা তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছে। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? কতজন তো সারাজীবন তপস্যা করে যায়। কই, মা তো তাদের দেখা দেয় না। মায়ের নিশ্চয়ই বিশেষ আশীর্বাদ আছে তার ওপর। হয়তো প্রিয়তমাকে ফিরে পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু প্রথমে কবিতা তো রচনা করতে হবে।

বিজয়ের ধারণা ছিল কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না। এর আগে কোনদিন একটা পঙিক্তও লেখেননি বিজয়। টোল পালানো বিদ্যাতে মরিচা ধরে গেছে। শেষমেশ কোনো উপায় না দেখে বিক্রমপুর থেকে নৌকায় রওনা দিলেন ময়মনসিংহের দিকে। ওদিকটায় মনসার পূজা খুব ধুমধাম করে হয়। হয়তো সেখানে এমন কোনো সিদ্ধপুরুষকে পাওয়া যাবে যে কাব্যদেবীর সুদৃষ্টি পাওয়ার উপায় বলে দেবে।

ময়মনসিংহ পৌঁছেও খুব একটা লাভ হলো না বিজয়ের। সেখানে সবাই মন দিয়ে মনসার পূজা করে ঠিক কিন্তু মায়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নিরুত্তর থাকে। বিজয়ের সন্দেহ হলো এরা না জেনেই মায়ের পূজা করছে।

শেষ পর্যন্ত অনেক দিন অনেক জায়গা ঘুরে এক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তার। তিনি বিজয়কে আরো উত্তরে গারো পাহাড়ে যেতে বললেন। সেখানে পৌঁছালেই হয়তো মা মনসার কৃপা জুটবে।

গারো পাহাড় তখন ভীষণ কুখ্যাত জায়গা ছিল। বাংলার মানুষ বিশ্বাস করতো পাহাড়ের ওপারে এমন একটা দেশ আছে, যেখানে সব ভয়ানক রাক্ষস বাস করে। গারো পাহাড়ে গেলে কেউ আর ফিরে আসতে পারে না।

তবে এই অলীক বিশ্বাসের বাইরে বাস্তব বিপদও কম ছিল না। সেকালে জায়গাটা ভীষণ অরণ্যে ঘেরা ছিল। বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার ও বুনোহাতির দল সেখানে কোনো উপদ্রব ছাড়াই বাস করতো। এছাড়াও বাস করতে কিছু মানবগোষ্ঠি যাদের বাংলার মানুষ নরখাদক বলে মনে করতো।

এই অচেনা দেশে যেতে হবে শুনে বিজয় ভীষণ ভয় পেলেন। অরণ্য রাক্ষস-নরখাদকের দেশে কীভাবে যাবেন ভেবে অস্থির হয়ে গেলেন।

কিন্তু যেতে তো তাকে হবেই। নইলে যে মহাসংকটে পড়েছেন তা থেকে মুক্তি পাবেন কীভাবে? প্রথমে কয়েকজন সঙ্গী-সাথি জোটানোর চেষ্টা করলেন বিজয়। টাকা-পয়সা তার কাছে সামন্যই ছিল। তিনি লোভ দেখালেন মনসার কৃপা লাভের। দেবীর বর পাওয়ার ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হয়, কিন্তু যেই শ্মশানে যেতে হবে গারো পাহাড়ে অমনি ভয়ে পিছিয়ে যায়।

এইভাবে বিজয়ের অনেকটা সময় ময়মনসিংহে কেটে গেল। বিরক্ত বিজয় একদিন একাই যাত্রা করেন গারো পাহাড়ের দিকে। কয়েকদিন হেঁটে পৌঁছান মধুপুর বনের প্রান্তে।

মধুপুর তখন বিরাট বন। বাঘ-চিতাবাঘ-ভালুক-গন্ডার-হাতির অভয়ারণ্য। এছাড়াও আছে চিত্রা ও মায়া হরিণ, বনগরু, নীলগাই, সজারু, শেয়াল, বুনো কুকুর, নানা বর্ণের পাখি ও প্রচুর পরিমাণ সাপ। এই সাপেদের বেশিরভাগই যে আবার বিষধর তা বলাই বাহুল্য।

বিজয় গুপ্ত আগেও বন দেখেছেন। বন্যপ্রাণীর দাপটও দেখেছেন। কিন্তু মধুপুরে তাদের রাজত্বের সঙ্গে আগের অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। মধুপুরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনে ঢুকার মুখে কতগুলো বানর ভেংচি কেটে তাকে স্বাগত জানালো। যেন বলতে চাইলো, 'মৃত্যুপুরীতে তোমাকে স্বাগতম! সেঁধে সেঁধে এখানে মরতে এলে কেন?'

মধুপুরে যত ভয় নিয়ে বিজয় এসেছিলেন কিছুক্ষণ পরে তা অবশ্য আর থাকলো না। গোধূলির আলো-আঁধারির মধ্যে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা মানব বসতি দেখতে পেলেন। বিজয় শুনেছিলেন এখানে মানুষ থাকে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে না জেনে আলাপ করতে যাওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলেন।

বসতি অপেক্ষাকৃত নতুন। বন কেটে বানানো হয়েছে। বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে চারপাশে কাঁটাগাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে ঝুপড়ি অনেকগুলো ঘর। উঠানে লাউ-শিম ইত্যাদি লাগানো হয়েছে। কিছু গবাদি পশুও দেখতে পেলেন। বসতির মানুষগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। অনেকে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে বসে গল্প করছে। বাচ্চারা জোনাকির পেছনে ছুটছে। রমণীদের অনেকে রান্নার বন্দোবস্ত করছে। সব মিলিয়ে বিজয়ের কাছে মানুষগুলোকে বিপজ্জনক মনে হলো না।

বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারলেন না বিজয়। অচিরেই বসতির পাহারাদার কুকুরের পাল তাকে ঘেরাও করে ফেললো। কয়েকজন যা ধরনের লোক এসে ধরে ফেললো তাকে। একটা ঘরে নিয়ে বন্দি করে রাখলো। তারপর অনেকটা এখনকার পুলিশের মতো অনবরত প্রশ্ন করতে থাকলো।

বিজয় গুপ্ত অনেক কষ্টে তাদের বোঝাতে পারলেন যে তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। বললেন, কেবল মনসার সেবা করার জন্যই অজানার পথে হাঁটা শুরু করেছেন। সঙ্গে একরাতের জন্য আশ্রয়ও চাইলেন।

লোকগুলো কী বুঝলো কে জানে। বিজয়ের বাঁধন খুলে দিলো। বলল, তারা একসময় ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাস করতো। কিন্তু সুলতানের কোতয়ালের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলের ভেতরে চলে এসেছে। এখানে বন্যপ্রাণীর ভয় থাকলেও মানুষের অত্যাচার নেই। শুনে বিজয় স্বস্তি পেলেন ।

ততক্ষণে রাত নেমে গেছে। নিশাচর প্রাণীদের ডাক মাঝে মাঝে পিলে চমকে দিচ্ছে। লোকগুলো বিজয়কে খেতে ডাকলো ।

বিজয় গিয়ে দেখেন এলাহীকাণ্ড সেখানে। খাওয়ার পর শুরু হলো মদ পান। বিজয়ের এই ব্যাপারে কখনোই অরুচি ছিল না। পানও করতে পারতেন অসুরের মতো তিনি লোকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোমরস পান করতে থাকলেন।

সবাই যখন মদের নেশায় চুর তখন বসতির একটা বোকামতো লোক বিজয়কে বলল, ‘আরে খাও খাও। বেশি করে খাও। একটু পরে তো তোমাকে মরতেই হবে।'

বিজয় চমকে উঠলেন, মানো মুহূর্তেই তার নেশা ছুটে গেল। লোকটাকে জিজ্ঞেস কী ব্যাপার? করলেন,

“বাইরে গিয়ে দেখ কী ব্যাপার। সবাই যজ্ঞের বন্দোবস্ত করছে। তোমাকে আজ বলি দেওয়া হবে।'

বাইরে উঁকি দিয়ে বিজয় দেখলেন সত্যিই যজ্ঞের আয়োজন চলছে। আগুনের সামনে বসে পুরোহিত কী সব মন্ত্র পড়ছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার। কিন্তু লোকগুলোকে কিছু বুঝতে দিলেন না। আরো কয়েক পাত্র মদ খেলেন। বললেন, ‘মরতে তো সবাইকে হবেই। তারচেয়ে চলো আনন্দ নিয়ে মৃত্যুর কাছে যাই।'

লোকগুলো আরো উৎসাহ নিয়ে পাত্র খালি করতে লাগলো। খানিক পরে বিজয় লোকগুলোকে বললেন, ‘বন্ধুরা, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। প্রকৃতির ডাক এসেছে।

কয়েকজন লোক বিজয়কে বাইরে নিয়ে গেল। তারা বিজয়কে বসতির সীমানায় নিয়ে গিয়ে দ্রুত কাজ সেরে নিতে বলল। তিনি একটা কাঁটার ঝোপের কাছে গেলেন। প্রস্রাব করার ভান করে লক্ষ্য রাখলেন লোকগুলোর ওপরে। নেশায় চুর লোকগুলো একটু অমনোযোগী হতেই উঠে বসলেন একটা গাছে। লাফ দিয়ে কাঁটার ঝোঁপ পেরুবেন এমন সময় লোকগুলো ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল। হই হই করে সবাই তেড়ে এলো। উপায় না দেখে কাঁটার ঝোপে লাফিয়ে পড়লেন বিজয়। সারা শরীর রক্তাক্ত হলো। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। লোকগুলো

দৌড়াতে দৌড়াতে কাছে চলে এসেছে। বসতির অন্যান্য অংশগুলোতেও সংবাদ চলে গেছে। সবাই তেড়ে আসতে লাগলো। তাদের সঙ্গে যোগ দিলো শিকারি কুকুরের পাল।

আহত শরীর নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন বিজয়। জঙ্গল ভেঙে ধাওয়া করতে থাকলো লোকগুলো। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিলেন, ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। পার্থিব জীবনে সব কিছু হারিয়েছেন। মা মনসার আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে পরকালেও জুটবে নরক। আজ কোনোভাবেই মরলে চলবে না। এদের হাত থেকে বাঁচতেই হবে।

কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর একটা জলাভূমি দেখতে পেলেন। নদীর দেশের মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরাতে লাগলেন। অনেকক্ষণ সাঁতরানোর পর পেছন ফিরে দেখলেন লোকগুলো মশাল হাতে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বা তাদের কুকুর কেউ জলে নামেনি।

ভয়ে ভয়ে বাকি অংশটা সাঁতরে গেলেন তিনি। লোকগুলোর হাত থেকে হয়তো বাঁচা গেছে। কিন্তু এই জলে কুমীর থাকার বিস্তর সম্ভাবনা আছে। রাতের বেলা তাদের চলাচলও বেড়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ ঘটলো না।

হয়তো মা মনসার কৃপাতেই অক্ষত অবস্থায় ওপারে পৌঁছালেন। রাতের বাকি অংশটা ওখানেই কাটালেন। সকালে উঠে রওনা দিলেন গারো পাহাড়ের দিকে।

বিজয়ের মনে তখন গভীর ভয় বাসা বেঁধেছে। মধুপুরে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো, গারো পাহাড়ে না জানি কী বিভীষিকা অপেক্ষা করে আছে। তবে মনে মনে এটা ভেবেও বল পেলেন যে, স্বয়ং মনসাই তাকে বাঁচিয়েছেন। বিপদ থেকে তিনিই রক্ষা করবেন।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদিন কেটে গেল। বিজয় তখন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। শরীর জুড়ে বিভিন্ন আঁচড়ের দাগ-চুলকানি-ব্যথা। খাদ্যের অভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছেন। বন্যপ্রাণী ও তারচেয়ে ভয়ানক মানুষের ভয়ে মানসিকভাবেও কাতর। প্রতিদিন সকালে তিনি হাঁটতে বেরোন। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়ম করে হাঁটেন। একেক সময় মনে হয় এই পথ বোধহয় ফুরাবে না। গারো পাহড়ে আর কোনোদিনই পৌঁছানো হবে না ।

এভাবে একদিন হাঁটতে হাঁটতে যখন হতাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন তখনই দিগন্ত রেখায় স্পষ্ট হলো দীর্ঘ একটা পাহাড়। বিজয় সমতলের মানুষ। পাহাড়ের সঙ্গে এই তার প্রথম দর্শন। পাহাড়ের বিশালত্ব তাকে মুগ্ধ করলো। স্মরণ করিয়ে দিলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় কতটা ক্ষুদ্র মানুষ। দ্বিগুণ উৎসাহে সেদিকে হাঁটতে থাকলেন।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে এসে কিছু মানুষের দেখা পেলেন বিজয়। এবার আর লুকিয়ে থাকতে হলো না। দূর থেকে তাকে দেখে লোকগুলো নিজেরাই এগিয়ে গেল। নিজেদের পরিচয় দিলো হাজং হিসেবে। খুব সরল, পরিশ্রমী আর হাসিখুশি মানুষগুলো বিজয়কে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেল।

তারপর খুব খাতির-যত্ন করলো। বিজয়ের মনে যে ভীতি ছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। তিনি হাজংদের মা মনসার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না।

বিজয় ভীষণ ভেঙে পড়লেন। এত কষ্ট করে শেষমেশ বোধহয় ভুল জায়গায় এসে পৌঁছেছেন।

গ্রামে বেরিয়ে একটা ছোট্ট মন্দির দেখতে পেলেন তিনি। কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই তার চোখে জল এসে গেল। এ যে মনসার মন্দির! বিগ্রহ হিসেবে তিনিই যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম করলেন। আবেগাপ্লুত বিজয়কে দেখে পুরোহিত এগিয়ে এলেন। তার কাছ জানা গেল হাজংরা মনসাকে 'কানি দিয়াউ' নামে চেনে। পুরোহিতকে এখানে আসার উদ্দেশ্য খুলে বললেন বিজয়। বললেন মনসা তাকে কাব্য লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কীভাবে কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

পুরোহিত বললেন প্রায় দুশো বছর আগে এক বঙ্গবাসী কবি বিজয়ের মতোই হঠাৎ এখানে এসেছিলেন। তিনিও ছিলেন মনসার অনুরাগী। তাকে নিয়ে একটা কাব্য লিখেছিলেন। ঘটনাক্রমে কাব্যটি এই গ্রামে বসেই লেখা হয়েছিলো। কিন্তু বঙ্গীয় ভাষায় লেখা বলে এর খুব একটা চর্চা হয়নি। পাণ্ডুলিপিটা মন্দিরেই আছে। বিজয় চাইলে তিনি সেটা দেখাতে পারেন।

আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছা করলো বিজয়ের। এটাই তো তিনি চাইছিলেন। এ কারণেই তো এতো কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি পুরোহিতকে অনুরোধ করলেন যেন এখনই কাব্যটি তাকে দেখতে দেওয়া হয়। পুরোহিত তালপাতায় লেখা কাব্যটি বের করে দিলে বিজয় মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন।

কবির নাম হরি দত্ত। পুরোহিত বললেন কবি অন্ধ ছিলেন। এজন্য কানা হরি দত্ত নামেই পরিচিত ছিলেন। নিজের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু লিখে যাননি কবি। শুধু লিখেছেন তার জন্ম ময়মনসিংহের দত্তবাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন মা মনসার ভক্ত। একদিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। ভবঘুরের বেশে এক নাগ পঞ্চমীর দিনে হঠাৎ হাজির হন গারো পাহাড়ে। সেখানেই পেয়ে যান কাব্যদেবীর আশীর্বাদ। প্রচণ্ড এক ঘোরের মধ্যে লিখে ফেলেন চাঁদ সওদাগরের কাহিনি।

হরি দত্তের কাব্য পড়তে পড়তে শিহরিত হলেন বিজয় গুপ্ত। এ যে মায়ের পায়ে চূড়ান্ত আত্মনিবেদন! মায়ের মহিমা প্রচারের জন্য এরচেয়ে ভালো সৃষ্টি আর হয় না। পড়তে পড়তে বিজয়ের মনে আলোড়ন হতে লাগলো। কবিতার পঙ্ক্তির

মধ্যে মা মনসাকে ভীষণ জীবন্ত মনে হলো। তিনি ভাবলেন চেষ্টা করলে তিনিও হয়তো পারবেন। হরি দত্তের মতো না হলেও মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে।

হাজংদের সঙ্গে বিজয় গুপ্ত দুই সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। তারপর রওনা দিলেন বাড়ির পথে। বন্ধুবৎসল হাজংরা তাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিলো। এজন্য ফেরার সময় খুব একটা কষ্ট হলো না। হরি দত্তের কাব্য সঙ্গে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন বিজয়। কিন্তু পুরোহিত তাতে রাজি হননি। এমন কী কাব্যটির অনুলিপিও করতে দেননি।

হাজংরা বিশ্বাস করে এই কাব্যের কারণেই কানি দিয়াউ হাজংদের সুরক্ষা দিচ্ছেন। এর কোনো অমর্যাদা হলে তিনি রুষ্ট হবেন। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। কাব্যের মূলভাব বিজয় জেনে গেছেন। এখন শুধু ধীর স্থির হয়ে লিখে ফেলার অপেক্ষা।

ময়মনসিংহ থেকে নৌপথে ফুল্লশ্রী গ্রামে ফিরে গেলেন বিজয়। অনেক দিন পর ছেলেকে দেখতে পেয়ে বাবা-মা কেঁদে অস্থির হলেন। ততদিনে তাঁদের রাগ পড়ে গেছিলো। একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

বিজয় গ্রামে ফিরে মনসার মাহাত্ম প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গ্রামে স্থাপন করলেন মনসা মন্দির। এর ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে কবিতা লেখেন। এক-একটি পালা লেখেন আর মন্দিরে জড়ো হওয়া ভক্তদের আবৃত্তি করে শোনান। ভক্তরা মন দিয়ে শোনে আর বিজয়ের কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে। শ্রোতাদের প্রেরণা পেয়ে বিজয় দ্বিগুণ উৎসাহে কাব্য রচনা করতে লাগলেন।

বাংলার সুলতান তখন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। প্রজাদরদী হিসেবে দারুণ খ্যাতিমান। তার মাতৃভাষা বাংলা ছিল না। তবে বাংলা কাব্যের সমঝদার ছিলেন। তিনি বিজয়ের কাব্যের প্রশংসা শুনতে পেয়ে তাকে ডেকে পাঠান গৌড়ের

রাজপ্রাসাদে। বিজয় সেখানে গিয়ে সুলতানকে পদ্মাপুরাণের কিছু অংশ শোনান। মুগ্ধ সুলতান বিজয়কে প্রচুর উপহার দেন। বলেন, এই কাব্যের পুরোটা শোনার জন্য তার তর সইছে না

খুশি হয়ে কাব্যে সুলতান হোসেন শাহের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন বিজয় গুপ্ত লেখেন:

"ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।

সুলতান হোসেন শা নৃপতি তিলক।

সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।

নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।।"

হোসেন শাহ অবশ্যই পৃথিবী শাসন করেননি। কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায় সুলতানকে কতটা ভক্তি করতেন বিজয়।

বাড়ি ফিরে আবারও কাব্য রচনা করতে বসলেন বিজয়। লেখেন আর নিজেই পড়ে দেখেন। পড়তে পড়তে এতটাই মুগ্ধ হন যে অন্য কবিদের তুচ্ছ মনে হয়। প্রতিদিনের রচনা মন্দিরে সমাবেত শ্রোতাদের শোনান। তাদের প্রশংসা বৃষ্টি পেয়ে আরো উদ্ধত হন। যে হরি দত্তের কাব্য পড়ে তার মধ্যে কবি ভাবের উদয় হয়, তাকেই ভীষণ আনাড়ি মনে হয়।

আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর হয়ে বিজয় লিখলেন :

'সর্বলোকে গীত গাহে না জানে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।।

হরি দত্তের গীত লুপ্ত পাইল কালে।

জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে।।

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুন্দর।

এক গাইতে আর গাই নাহিক মিত্রাক্ষর।।'

সন্ধ্যার আসরে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নতুন পঙক্তিগুলো শ্রোতাদের শোনালেন বিজয়। ভক্তরা বার বার বলতে লাগলো, 'হরি দত্ত আবার কে? বিজয় গুপ্তই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

ভক্তদের মধ্যে নিজের নাম উচ্চারিত শুনে তীব্র আনন্দে ভেসে গেলেন বিজয়। এটাই তো প্রতিটা কবির স্বপ্ন। কবি হিসেবে যশলাভের জন্যই সবাই লালায়িত হয়ে থাকে । আজ তার কবিতা সার্থক হয়েছে। নিজের সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকার তৃপ্তি নিয়ে ঘুমাতে গেলেন বিজয়।

রাতে স্বপ্নে আসলেন মনসা। বিক্রমপুরে যেভাবে দেখা দিয়েছিলেন এবারে তার ঠিক বিপরীত। থমথমে মুখে বিজয়ের দিকে চেয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না। মাকে দেখতে পেয়ে স্বপ্নের ঘোরেই বিজয় অনেক অনুনয় করলেন। তিনি যে মায়ের সর্বোচ্চ সেবক সেটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মায়ের মন গললো না। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় বুঝতে পেলেন কিছু একটা ঠিক নেই।

সকালে উঠে তিনি স্নান করে পবিত্র হলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরে মা মনসার আরাধনা করলেন। সামনে শ্রাবণ মাস। নাগ পঞ্চমীর দিনে আরো বড় করে মনসার পূজা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। এরপর দিনের পর দিন কেটে গেল। কিন্তু বোঝা গেল না মনসা সন্তুষ্ট হয়েছেন কী না।

মুরুব্বি স্থানীয় অনেককে ঘটনা খুলে বললেন। তারা পরামর্শ দিলেন কবিতায় পরিবর্তন আনতে। কিন্তু নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ বিজয় গুপ্ত তাতে সায় দিলেন না। আত্মস্তুতিতে ডুবে থাকা বিজয় ভাবলেন হরি দত্তকে ছোট করে এভাবেই যুগের পর যুগ মনসামঙ্গলের সেরা কবি হিসেবে টিকে থাকবেন ।

এভাবে একদিন শ্রাবণ মাস এসে গেল। বর্ষার মাতোয়ারা জলে সিক্ত হলো পূর্ববঙ্গ। সময় এলো নাগ পঞ্চমীর! মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে কাব্য রচনা করলেন বিজয় গুপ্ত। নাগ পঞ্চমীর তিথিতে খুব বড় করে পূজা হলো ফুল্লশ্রী গ্রামে। সবাই মনসার নামে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। সাত দিন সাত রাত ধরে পাঠ করা হলো বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'।

সে রাতে মনসা প্রসন্ন হলেন। হাজির হলেন বিজয় গুপ্তের স্বপ্নে। এবারে মা কথা বললেন। জানালেন অনুগ্রাহী হরি দত্তের অবমাননা ভীষণ ক্ষুব্ধ করেছে তাকে। তবে বিজয় গুপ্তের সাধনাও তাকে তৃপ্তি দিয়েছে। হরি দত্তের রচনা তাকে মানুষের সমাজে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেজন্য বিজয়কে একটা শাস্তি তার দিতেই হবে।

ভয়ে আকুল হলেন বিজয়। মায়ের কাছে বারবার ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু মনসা নিজের প্রতিজ্ঞায় অটুট। এক সময় স্বপ্ন ভেঙে গেল বিজয়ের। ঘেমে নেয়ে গেছেন তিনি। তখনো রাত ভোর হতে বাকি। মায়ের কৃপা চাইতে চাইতে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব সকালে ঘুম ভাঙতেই একটা ধাক্কা খেলেন। ডান চোখে কিছুই দেখছেন না। অন্ধ হয়ে গেছেন। ভয়ে ত্রাসে কাঁদতে থাকলেন, কিন্তু কাউকে জানতে দিলেন না। বুঝতে পারলেন পুর্বসূরীর অবমাননার সাজা পেয়েছেন।

এমনই একরোখা মানুষ ছিলেন যে কবিতার ওই পঙক্তিতে একটুও পরিবর্তন আনলেন না। যেভাবে লিখেছিলেন ও রকমই রেখে দিলেন।

এভাবে একটা সময় ‘পদ্মপুরাণ' লেখার কাজ শেষ করলেন। বাবা মায়ের ইচ্ছায় বিয়েও করলেন। ততদিনে কবি হিসেবে দারুন খ্যাতিমান হয়েছেন। দিকে দিকে বিজয়ের নামে ধন্য ধন্য রব উঠেছে। সুলতান হোসেন শাহও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন সময় প্রথম সন্তানের বাবা হলেন বিজয়। পিতৃত্বের আনন্দে ভেসে গেলেন। ছেলের মধ্যে দেখতে পেলেন জীবনের সর্বোচ্চ অর্জন। না পাওয়ার অনেক পুরনো বেদনাই গেল ঘুচে।

তবে ছেলে বড় হতেই উচ্ছ্বাস কেটে গেল। সেও যে বিজয়ের মতো ডান চোখে

দেখতে পায় না।

সেই থেকে মনসার অভিশাপ আমাদের সঙ্গী হয়ে রইলো। এখন পর্যন্ত আমরা কেউ ডান চোখে দেখতে পাই না। পূর্বপুরুষের একটুখানি অহংকার বংশ পরম্পরায় আমাদের জন্য অভিশাপ হয়ে রইলো।

***

ভদ্রলোক গল্প শেষ করে থামলেন। সবাই এতক্ষণ তন্ময় হয়ে গল্প শুনছিলো। তিনি থামতেই অনেকগুলো জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো।

এবারে সন্তোষ গুপ্ত তাকে অভয় দিলেন। বললেন, 'সাহস করে বলে ফেল। গল্পে গল্পে রাতটা খারাপ কাটছে না। আমাদের গল্প তো শুনলে। এবার তোমার পালা।’

চোখে-মুখে দ্বিধা নিয়ে কিশোর খানিকক্ষণ সবার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বলতে শুরু করলো তার গল্প।

আলাউদ্দিন মণ্ডলের গল্প

আমার নাম আলাউদ্দিন মণ্ডল। এলাকার মানুষ আমাকে অবশ্য মণ্ডলের নাতি নামেই চেনে। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার বয়স সাতান্ন বছর পূর্ণ হয়েছে। যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা আনুমানিক সাতাশ বছর আগের ঘটনা। অর্থাৎ ওই সময় আমার বয়স ছিল তিরিশ।

মূল ঘটনায় যাওয়ার আগে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলে নিচ্ছি। তাহলে গল্পটা বুঝতে সুবিধা হবে। জন্মের সময় আমার মা মারা যায়। মৃত্যুর সময় মায়ের বয়স ছিল মাত্র সতেরো। এই বয়সি মেয়েদের তখন দুই তিনটা বাচ্চা থাকতো। কিন্তু আমার নানা ছিলেন দারুণ শৌখিন। মহিমাগঞ্জের নামকরা মানুষ। মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন।

স্কুলে যাওয়ার পথেই একদিন মাকে দেখেন বাবা। দেখেই প্রেমে পড়ে যান। তিনিও ছিলেন নামজাদা পরিবারের সন্তান। আমার দাদা ছমিরউদ্দি মণ্ডল ছিলেন গোবিন্দগঞ্জের সবচেয়ে ধনী মানুষ। তার বিঘার পর বিঘা জমি ছিল। গোয়ালে প্রচুর গরু ছিল। বড় বড় মাছে ভরা পুকুর ছিল। আমার আব্বা ছিলেন তার একমাত্র সন্তান। কোনো ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই দুইজনের বিয়ে হয়।

গোবিন্দগঞ্জ তো বটেই, পুরো গাইবান্ধার যে কোনো বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, এই বিয়ের কথা বলতে পারবে। বিয়ের জন্য ছমিরুদ্দি মণ্ডল বিহারের পাটনা থেকে পটকাবাজি নিয়ে এসেছিলেন। ঢাকা থেকে এনেছিলেন ব্যান্ড পার্টি। ফসলের মাঠে বিরাট শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে শত শত মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। হিন্দু- মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা খাবারের আইটেম ছিল। তিন দিন-তিন রাত ধরে উৎসব চলেছিল। এত টাকা-পয়সা খরচ করেছিলেন যে

কলিকাতার একটা পত্রিকা এটা নিয়ে নিউজ করেছিল। গোবিন্দগঞ্জের ইতিহাসে এত জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে আর কখনো হয়নি।

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই আমার জন্ম ও মায়ের মৃত্যু হয়। আব্বা আমার মাকে খুব ভালোবাসতেন। শোকে-দুঃখে পাগলের মতো হয়ে যান। আমার দাদা তখনো বেঁচে ছেলেকে বিয়ে দিতে খুব চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা কিছুতেই বিয়ে করেননি। আমি দাদাবাড়িতে বড় হতে লাগলাম। আমার চাচা-ফুপু কেউ না থাকলেও দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন কম ছিল না। তাদের অনেকেই আমাদের বাড়িতে আশ্রিত ছিল। তাদের হাতেই বড় হতে থাকলাম।

আমার প্রতি আব্বার অনুভূতি ছিল মিশ্র। একদিকে ভালবাসার একমাত্র ফসল হিসেবে আমি ছিলাম তার চোখের মণি, অন্যদিকে মায়ের মৃত্যুর জন্য তিনি আমাকে দায়ী মনে করতেন। ছোট হলেও আমি সব বুঝতে পারতাম। আমরা ছোটদের যতটা বোকা ভাবী আসলে তারা ততটা বোকা না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি।

আমাদের বাবা-ছেলের সম্পর্ক এমনই অস্বস্তিকরভাবে চলছিলো। এরমধ্যে চলে এলো ১৯৭১ সাল। আমি তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। ঢাকা- রংপুর রোডে পড়ে বলে গোবিন্দগঞ্জে জোরেশোরে শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের পরিবারে অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ বলা হতো না। আমরা বলতাম গন্ডগোল।

আমার দাদা পুরানো মুসলিম লীগার ছিলেন। চল্লিশের দশকে যখন পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার ওঠে, তখন থেকে তিনি মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। দাদার দেখাদেখি আব্বাও মুসলিম লীগের রাজনীতি শুরু করেন। দলের তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। সারাদেশে আওয়ামী লীগের পক্ষে, নৌকার পক্ষে জোয়ার উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর নাচনে মানুষ নাচছে। কিন্তু আমার বাপ-দাদা দল চেঞ্জ করেন নাই। তারা তাদের পাকিস্তানি আদর্শে অটুট থাকলেন।

দেশে গন্ডগোল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করা হলো। আমার দাদা হলেন সভাপতি। আব্বাও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতার রক্ষার বাইরে তাদের আরেকটা দুশ্চিন্তা ছিল। আমরা ঠিক জমিদার না হলেও যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক ছিলাম। অন্যদিকে এলাকার বেশিরভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র। এদের অনেকের অভিযোগ, আমাদের বংশ যুগের পর যুগ ধরে তাদের শোষণ করেছে। এই মানুষগুলোর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলো। পিতা-পিতামহ দুজনেই ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন এই গন্ডগোলের সুযোগে ছোটলোকগুলো আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে । সেজন্য আর্মি ডেকে তাদের শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

গোবিন্দগঞ্জের একমাত্র ভারী শিল্প ছিল মহিমাগঞ্জের রংপুর চিনিকল। সেখানে পাকিস্তানি আর্মির আনাগোনা ছিল। শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে তাদের গ্রামে ডাকলেন দাদা। এলাকার যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের একটা তালিকা বানিয়ে আর্মির হাতে তুলে দিলেন। এই মানুষগুলোর মধ্যে বাঙালি ছিল, সাঁওতাল ছিল।

আর্মি এসে এদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিলো। মেয়েদের ওপর নির্যাতন করলো। ছোট-বড় প্রায় সবাইকে মেরে ফেললো। বাপ-দাদার কাজকর্ম যে ঠিক হচ্ছে না সেটা ঠিকই বুঝেছিলাম। কিন্তু আমি বুঝলেও তারা বুঝলেন না। পাকিস্তানি আদর্শের জোশ তাদের অন্ধ করে দিয়েছিল। এলাকায় তারা নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে গেলেন।

কিন্তু পাপ বাপকেও ছাড়ে না। অক্টোবরের শেষের দিকের এক রাতে আব্বা বাজার থেকে ফিরছিলেন। রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ধরে ফেলে। হত্যা করে লাশ টাঙিয়ে রাখে কাঁঠাল গাছের ডালে। সঙ্গে একটা চিরকুট রেখে যায়। যাতে লেখা ছিল, পাকিস্তানের দালালরা সাবধান! তোমাদের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ।

আব্বার মৃত্যুর পর পাকিস্তানি আর্মি এলাকায় নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে তীব্র হয় মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ। ধীরে ধীরে পাকিস্তানিরা পিছু হটতে থাকে। তারা বুঝে গিয়েছিল পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা সারেন্ডার করে। আমার দাদা জানতেন তার হাতে সময় বেশি নেই। তিনি আমার একমাত্র মামাকে ডেকে তার হাতে আমার দায়িত্ব তুলে দিলেন।

এলাকার যেসব মানুষ পালিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরে আসতে শুরু করলো। আমাদের পরিবার রীতিমতো একঘরে হয়ে গেল। আমাদের গরু বাছুর, মাঠের ফসল, গাছের ফল, পুকুরের মাছ মানুষ নিয়ে যেতে শুরু করলো। আমাদের বাড়ির কাউকে দেখলে মানুষ থুতু ফেলতো। আমার দাদা নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। সারাদিন বাড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকতেন। ঘরের চালে কেউ ঢিল মারলে ভয়ে লাফ দিয়ে উঠতেন। পরাজয়ের যন্ত্রণা তাকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছিলো।

অচিরেই দাদার নামে দালাল আইনে মামলা হলো। আমরা আরো একঘরে হয়ে গেলাম। এক রাতে পুলিশ এসে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল। আমাদের বাড়ি শুন্য হয়ে গেল।

পরের দিন মামা এসে আমাকে নিয়ে গেল। মামাবাড়িতে আমার সময় খুব খারাপ কাটছিলো না। মামা ছিলেন পোস্ট মাস্টার। মা মরা ছেলে হিসেবে মামিরও যথেষ্ট আদর- যত্ন পাচ্ছিলাম। ততদিনে আমার নানা-নানি মারা গিয়েছিলেন। মামার সন্তানদের সঙ্গে আমি বড় হতে শুরু করলাম।

আমার পরিবার যে স্বাধীনতা বিরোধী ছিল সেটা এই এলাকার মানুষ জানতো । কিন্তু আমি ছোট ছিলাম বলেই হয়তো আমাকে খুব একটা বিরক্ত করেনি। তবে স্কুলে বেশ খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকদের কেউ পছন্দ করে না। আমার বাপ-দাদার অপকর্মের দায় আমাকেও নিতে হচ্ছিলো। সব মিলিয়ে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা সহজ হয়নি।

বছরখানেক পর একদিন মামা এসে স্কুলে হাজির। এসে আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে সোজা দাদাবাড়ি গেলেন। বাড়ি ফিরে জানতে পারলাম আমার দাদা আর নেই। জেলের কুঠুরিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রবল প্রতাপশালী ছমিরুদ্দি মণ্ডলের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কী দাপট ছিল তারা মানুষজন আড়ালে মণ্ডলের ব্যাটা নামে ডাকলেও সামনাসামনি তাকে দারুণ তোয়াজ করতো।

বিশাল একটা পরিবারের অধিকর্তা ছিলেন। বাড়ির সদস্য ও আশ্রিতদের জন্য তার কথাই ছিল আইন। কতজন ছুটে আসতো তার সেবা করতে। সেই মানুষটা কী না মারা গেলেন একা।

সবাই খুব জোরাজুরি করলেও আমি শেষবারের মতো দাদার মুখ আর দেখলাম না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত মামার বাড়িতেই থাকলাম। ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। সায়েন্স থেকে প্রথম বিভাগ পেয়েছিলাম। তখনকার দিনের খুব ভালো রেজাল্ট। স্কুলের শিক্ষকরা বললেন, 'তুমি রংপুরে যাও। কারমাইকেল কলেজে গিয়ে ভর্তি হও।'

কারমাইকেল তখন উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা কলেজ ছিল। ওখানেই ভর্তি হলাম। এবার নিলাম আর্টস। পড়াশোনার চাপ খুব বেশি ছিল না। কলেজ পাড়ার একটা মেসে উঠলাম। প্রথম প্রথম পড়ালেখা ভালোই করতাম। স্যারদের নজরে পড়েছিলাম। ভালো ছাত্রদের স্যাররা আলাদা চোখে দেখতেন। তারা মনে করতেন এই ছেলেগুলো একদিন ভার্সিটিতে পড়বে। ভার্সিটিতে পড়া তখন এতো সহজ ছিল না। উত্তরবঙ্গের একমাত্র ভার্সিটি ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা ভার্সিটিতে পড়তে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হতো। রাস্তাঘাট ভালো না, তা ছাড়া বঙ্গবন্ধু সেতুও ছিল না। তখনকার দিনে উত্তরের মানুষ খুব বেশি ঢাকায় যেত না।

স্যারদের স্বপ্ন অবশ্য পূরণ করতে পারিনি। খারাপ বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়েছিলাম। তাদের সঙ্গে নেশা করতে শুরু করলাম। এখন তো ড্রাগসের ছড়াছড়ি। তখনও কম ছিল না। গাঁজা সরকারি দোকানে পাওয়া যেত। এরশাদ সরকার শেষের দিকে জিনিসটা ব্যান্ড করে দিলো।

শাপলা চত্বরের পাশে ভাটিখানা নামের একটা জায়গা ছিল। সেখানে ভালো বাংলা মদ পাওয়া যেত। প্রথমে মাসে দুই-একবার যাইতাম। ধীরে ধীরে রেগুলার হলাম। প্রতিদিন গিয়ে পড়ে থাকতাম। মেয়ে-মানুষের নেশাতেও পড়লাম। কীভাবে কী হলো জানি না। জ্ঞান-বুদ্ধি সব যেন লোপ পেল। দুহাতে টাকা ওড়ানো শুরু করলাম। পড়াশোনা আগেই লাটে উঠেছিল। এবার একেবারে ছেড়ে দিলাম।

ওই সময়ের কথা এখন ভাবলে নিজেকে নিজেরই ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওরকম করার কারণটাও বুঝতে পারি। আমার বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা সুখের ছিল না। মা- বাবা-দাদার মৃত্যু, পরিবারের ভেঙে যাওয়া, মামার বাসায় আশ্রিত জীবন সব মিলিয়ে রংপুরে একা থাকার সময়টা আমার কাছে মুক্তির মনে হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা কীভাবে সামলাতে হয় জানা ছিল না। বেসামাল হয়ে গেছিলাম।

যাইহোক, আমার অধঃপতনের খবর মামার কাছে গিয়েছিল। তিনি সত্যি সত্যি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। আমাকে ঠিক করার চেষ্টা করলেন। মেসে এলেন, কলেজে গিয়ে স্যারদের সঙ্গে কথা বললেন। গ্রামের বাড়ির যেসব জমি আমি বেচে দিচ্ছিলাম তার ক্রেতাদের ডেকে শাসিয়ে পর্যন্ত দিলেন। আমার বোধবুদ্ধি তখন একেবারে লোপ পেয়েছে। মামা আমার ফুর্তিতে বাধা দিচ্ছে দেখে একদিন বাড়িতে গিয়ে খুব গালাগালি করলাম। মামিকে মারতে পর্যন্ত গেলাম। এরপর মামা আমাকে আর বাধা দেয়নি। দেবেই বা কোন মুখে? সে জায়গাটা আমি রাখতে দিয়েছি কী?

আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেলাম। বাড়ির ভিটা ছাড়া সব ফসলি জমি বেচে দিলাম। আস্তে আস্তে আমার হাত খালি হতে শুরু করলো। চোখে অন্ধকার দেখা

শুরু করলাম। বন্ধু-বান্ধবেরা কেটে পড়তে শুরু করলো।

এই সময় একবার নেশার আড্ডা থেকে ধরে নিয়ে পুলিশ আমাকে কোর্টে তুললো। বিচারে ১৫ দিনের কারাদণ্ড হলো। জেলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। তখনো জানি ন না ক'দিন পরেই দীর্ঘ সময়ের জন্য আবারও জেলে ঢুকতে হবে। জেলখানাতেই পরিচয় হলো কুখ্যাত মরতু ডাকাইতের সাথে। মরতু আমার বাপ-দাদাকে চিনতো। আমাদের বাড়িতে বোধহয় কয়েকবার ডাকাতিও করেছিল। উঁচু বংশের ছেলে হিসেবে সে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করলো। নইলে জেলের পরিবেশে এক সপ্তাহ টেকাও আমার জন্য কঠিন ছিল।

কারাদণ্ড পূর্ণ করে আমি ছাড়া পেলাম। এর দুই মাসের মধ্যে মরতুও ছাড়া পেল। মরতুকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। সংক্ষেপে ডাকতাম 'মরতুচা'। সে বাড়িতে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার তখন করুণ অবস্থা। না পারতেছি নেশা করতে, না পারতেছি আয়-ইনকাম কিছু করতে। মরতুচা এসে বলল তার সঙ্গে কাজ করতে। আমি রাজি হলাম। এছাড়া আর কোনো উপায় আমার ছিল না।

প্রথম দিন ডাকাতি করতে গেলাম সুন্দরগঞ্জের মোঙলাকুটিতে। মরতুচা খবর পেয়েছিল পুকুর কাটতে গিয়ে শমসেল মাস্টার একটা সোনার টাকাভর্তি ড্যাগ পাইছে। ড্যাগ বোঝেন? ড্যাগ মানে হইলো হাড়ি।

আমাদের মিশন ছিল পুরা বাড়ি ঘেরাও করে ড্যাগটা নিয়ে কেটে পড়বো। আমাদের দলে ছিল দশ-বারোজন। মরতুচা লিডার। তার হাতে ব্রিটিশ আমলের একটা বন্দুক। অন্যদের কাছে কিরিচ, দা, ছুরি। আমার হাতে ছিল একটা বাঁশের লাঠি।

রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে শমসেল মাস্টারের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলি। বেশ অবস্থাসম্পন্ন মানুষ ছিল শমসেল মাস্টার। আমরা দরজা ধাক্কানো শুরু করতেই মাস্টারের বড় ছেলে আতাউল একটা রামদা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

মরতুচাকে দেখে বলে, ‘নাংচুন্নির ব্যাটা, এতো বড় সাহস তুঁই হামার বাড়িত আসি ঢুকছিস?'

মরতু কোনো জবাব না দিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। মুহূর্তেই আতাউলের খুলি চুরমার হয়ে যায়।

জীবনে এই প্রথম মানুষকে খুন হতে দেখলাম। দেখলাম মরার আগে মানুষ কীভাবে তড়পায়। আতঙ্কে আমার গলা পুরা শুকায়ে গেছিলো। আতাউলের লাশ ফেলে রেখে আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকি।

শমসেল মাস্টার খাটের নিচে লুকিয়ে ছিল। আমাদের লোকেরা তাকে টেনে বের করে। চড়-থাপ্পড় মারার পরও ব্যাটা টাকার ড্যাগটা দিতে চাচ্ছিলো না। খালি হাউমাউ করে বলতেছিল, ‘আমি কিছু জানি না। আমি কোনো ট্যাকার ড্যাগ পাই নাই। '

শেষে মরতুচা তাকে টেনেহিঁচড়ে আতাউলের লাশের কাছে নিয়ে গেলে মাস্টার ভেঙে পড়ে। বলে দেয়, ঘরের এককোণে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে ড্যাগটা। আমরা মাটি খুঁড়ে সেটা বের করি। একটা পুরানা ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে বেশকিছু টাকা পাওয়া যায়। আমরা সেগুলো নিয়ে যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি দেখি সর্বনাশ! মশাল হাতে কয়েকশো মানুষ মাস্টারের বাড়ি ঘিরে রেখেছে।

মরতুচা বলল, শমসেলের ছোট ব্যাটার কাম। কোন সমে যে বাড়ি থাকি পালাইল বুঝবারে পারমু না।

কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্রথমদিন ডাকাতি করতে এসে এমন অভিজ্ঞতা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই লিডারের নির্দেশের জন্য

অপেক্ষা করতে লাগলাম। মরতুচা ডাকাতির মালগুলো নিজের কাছে নিলো। তারপর আমাদের সবাইকে পালানোর নির্দেশ দিলো।

কিন্তু এতো মানুষের মধ্যে কীভাবে পালাই? মানুষগুলো গুলির শব্দ শুনেছে। বুঝছে, হয় কেউ মারা গেছে নইলে জখম হয়েছে। ডাকাতদের ব্যাপারে তখন মানুষের সীমাহীন রাগ ছিল। ধরতে পারলে আমাদের ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে। শমসেল মাস্টারের বাড়ির পেছন দিকে খালি ভিটা। মানে যতদূর চোখ যায় সব ফসলি জমি। সেদিক দিয়ে দৌড়ানো শুরু করলাম। দৌড়াই আর হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই।

তখন বর্ষাকাল। জায়গায় জায়গায় পানিও জমেছে। আর আছে বিষাক্ত সাপের ভয়। সব মিলিয়ে আমার জন্য অনুকূল অভিজ্ঞতা না। এর মধ্যে দিয়ে দৌড়ে অনেকদূর গেলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় দেখি শরীর আর চলে না। বুকের ভেতর এক ফোঁটা দম নেই। দুই পা যেন অবশ হয়ে গেছে। গলা শুকায়ে কাঠ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা।

পেছন ফিরে দেখি মশাল হাতে মানুষের দল তখনো ছুটছে। এতক্ষণে এরা নিশ্চয়ই আতাউলের মৃত্যুর খবর পেয়েছে। আমাদের দলের কাউকে পেলে কচুকাটা করে ফেলবে।

উপায় না দেখে আবার দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু বেশিদূর না যেতেই কীসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। পড়বি তো পড়, একটা বাঁশের গোড়ার ওপর গিয়ে পড়লাম। খুব কষ্ট হচ্ছিলো। অন্ধকারের মধ্যে প্যান্ট তুলে দেখি পা-টা রক্তাক্ত। বাঁশের সূচালো অংশ চামড়া ভেদ করে মাংসের ভেতর ঢুকেছে। বুঝলাম আজ আর রক্ষা নেই। মারাই যেতে হবে আজকে। ওদিকে কয়েকশো মানুষ হল্লা করতে করতে আমার পেছনে ছুটে আসছে। অচিরেই তারা এসে আমাকে ধরে ফেললো। মারতে মারতে শমসেল মাস্টারের বাড়িতে নিয়ে গেল।

গিয়ে দেখি মরতু ডাকাইতও ধরা পড়েছে। দলের অন্যদের মধ্যে তিন চারজন পালাতে পেরেছিল। বাকিদের বাড়ির উঠানের আম-কাঁঠালের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গ্রামের মুরুব্বি লোকেরা হাজির হয়েছে। আতাউলের ছোট ভাই তার মৃত ভাইয়ের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। সে একটা রামদা দিয়ে কুপিয়ে মরতুর দুই হাতের কবজি কেটে ফেললো। মরতুর রক্তহিম করা চিৎকারে আমার আত্মা উড়ে গেল। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছি। মনে হচ্ছিলো, এবার আমার পালা। ওরা আমার গলা কাটবে।

কিন্তু গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি আমাকে চিনতে পারলো। এদের অনেকেই আমার নানা-দাদাকে চেনে। তার সুবাদেই আমার শাস্তি কম হলো। মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আমার হাত-পায়ের হাড় চুরমার করে দেওয়া হলো। মুরুব্বিদের বাধায় আমাদের কাউকে জানে মারলো না।

ততক্ষণে খবর পেয়ে সুন্দরগঞ্জ থেকে পুলিশ চলে এসেছে। তারা আমাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখান থেকে থানায়। বিচারে আমাদের সাত বছর করে কারাদণ্ড হলো। বুঝতে পারলাম আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখান থেকে উঠে দাঁড়াব সে সাধ্য নেই।

কিন্তু আস্তে আস্তে আমার মনোবলে পরিবর্তন আসলো। জেলে থেকেই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম। পাস করলাম। দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল। জেল জীবন আর কিছু হোক না হোক আমাকে ধৈর্য ধরতে শিখিয়েছিল। জেল থেকে অনেক শিক্ষা নিয়ে বেরোলাম। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ডিগ্রিতে ভর্তি হলাম। মামা আমাকে ত্যাগ করলেও জেলে যাওয়ার পর আমার ভিটা আগলে রেখেছিলেন। তার পা ধরে মাফ চাইলাম। মাফ করে দিলেন। আমি পড়ালেখার পাশাপাশি একটা ছোটোখাটো ব্যবসা করা শুরু করলাম ।

এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। ব্যবসার কাজে একদিন বগুড়া গেছি। জলেশ্বরীতলার রাস্তা ধরে হাঁটছি। এমন সময় কে যেন পেছন থেকে ডাক দিলো। ফিরে দেখি মরতু ডাকাইত। রাস্তায় বসে ভিক্ষা করছে। মাথায় ময়লা একটা টুপি।

থুতনিতে সামান্য কয়েকগাছি দাড়ি। ময়লা জামা কাপড়ের গন্ধে পাশে বসা কঠিন। আমার মায়া হলো। অন্তত কয়েকদিন সে আমার পাশে ছিল। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

মরতুকে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমাকে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। দুই চোখের কোণের শুকনা পিচুটি চোখের পানিতে সজীব হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার সময় ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসলাম। আমার আশ্রয়ে রাখলাম। খেতে-পরতে দিলাম।

বিষয়টা মামার পছন্দ হলো না। তাকে বুঝিয়ে বললাম, ব্যবসার জন্য মরতুকে আমার প্রয়োজন আছে। সে হয়তো এখন পঙ্গু কিন্তু এলাকায় যথেষ্ট পরিচিতি আছে। গোবিন্দগঞ্জে ব্যবসা করার জন্য আমার কিছু প্রোটেকশনের দরকার আছে।

মরতু আমাকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করতে শুরু করলো। তার পরামর্শ শুনে আমার কিছু লাভও হলো। আমি তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। ততদিনে তার চেহারা বদলে গেছে। আগের মতো তেলচিক্কন হয়েছে। মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল রেখেছে। দুই হাত তার নাই। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আগের ধার আছে। মানুষ তাকে ভয় পায়। শুধু ‘মরতু ডাকাইত' থেকে তার নাম হয়েছে ‘হাতকাটা মরতু’।

মরতু একদিন আমাকে একটা নতুন ব্যবসার কথা বলল। বলল সে শুনেছে ঢাকা-রংপুর রোড নাকি বিশ্বরোড হবে। কোরিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে রাস্তার কাজ করবে। এই রাস্তা বানাতে প্রচুর ইটের প্রয়োজন হবে। মরতু বুদ্ধি দিলো একটা ইটভাটা দিতে। এতে লাভ হবে যে আমি চিন্তাও করতে পারবো না। একলাফে ছমিরুদ্দি মণ্ডলের যুগে ফিরে যেতে পারবো।

কথাটা আমার মনে ধরলো। বিষয়টা নিয়ে আরো খোঁজ-খবর নিলাম। জানতে পারলাম আসলেই বিশ্বরোড হচ্ছে। সেজন্য প্রচুর ইটের প্রয়োজনও হবে। ঠিকাদারকে ম্যানেজ করলে অনেক বড় একটা দাও মারা যাবে। ঠিক করলাম ইটভাটা দেব। কিন্তু বড় একটা সমস্যাও ছিল। ভাটা দেওয়ার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। ব্যবসা করে কিছু জমিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। মরতুচা বুদ্ধি দিলো বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখতে।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু দোটানায় ছিলাম। অনেক বড় রিস্ক হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করার নেই। রিস্ক না নিয়ে কেউ কোনোদিন বড়লোক হয় নাই।

এলাকার নতুন ধনী শাহ আলমের কাছে বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখলাম। তারপর জোরে শোরে শুরু করলাম ইটভাটার কাজ। ভাটার জন্য প্রচুর জমি লাগে। তাও যে সে জমি হলে হয় না। ইটের প্রধান উপকরণ এঁটেল ও দোআঁশ মাটি। সেটাও ম্যানেজ করতে হয়। সবকিছুর ব্যবস্থা মরতুই করলো। একটা ভাটা চালাতে লাখ লাখ সিএফটি মাটি পোড়াতে হয়। প্রচুর শ্রমিকও লাগে। এদের আবার দাদন সিস্টেমে অগ্রিম টাকা দিতে হয়। এলাকার কিছু লোককে শ্রমিক হিসেবে নিলাম। সর্দার হিসেবে রাখলাম মরতুচাকে ।

আস্তে আস্তে ইটভাটার কাজ শেষ হলো। ততদিনে বিশ্বরোডের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কোরিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা চলে এসেছে। ঠিকাদারকেও মোটামুটি ম্যানেজ করা হয়ে গেছে। আমরা ভাটার কাজ শুরু করে দিলাম।

কিন্তু কপাল এতটাই মন্দ যে ইটের রং ভালো হলো না। তবুও ঠিকাদারের কাছে প্রথম চালান পাঠালাম। পরের দিনই চালান ফেরত এলো। ঠিকাদারের ইট পছন্দ হয়নি।

মরতুচা অবশ্য বলল, ঠিকাদার নাকি ইট নিতে চেয়েছিল কিন্তু কোরিয়ানরা নাকি কোনোভাবেই নিতে দেয়নি। কুকুরখেকো হলেও এরা খুব বিশ্বস্ত জাত। কাজে

একচুল ফাঁকি দেয় না।

এইভাবে কয়েক ব্যাচ ইট পোড়ানোর পরও কাঙ্ক্ষিত রং পেলাম না ।

বারবার চালান ফিরে আসতে লাগলো। ঠিকাদার একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠলো। মরতু খবর আনলো ওরা আর একবার দেখবে। এরপরও ভালো ইট না পেলে কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দেবে।

আমার তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতো অবস্থা। এই ব্যবসার পেছনে আমার সবকিছু ঢেলে দিয়েছি। লস খেলে একেবারে রাস্তায় বসে যেতে হবে। আমার পাগল দশা দেখে মরতু চিন্তা করতে নিষেধ করলো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। এটা আমার জীবন-মরণের সমস্যা। লস করলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে নামতে হবে। মরতু খুব অভয় দিলো। বলল, কালই একজনকে নিয়ে আসবে যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় এক ওঝাকে নিয়ে হাজির হলো সে। ওঝা অনেকক্ষণ মন্ত্র-টন্ত্র পড়লো। ভাটায় গিয়ে চুল্লি দেখে আসলো। মাটি নিয়ে সারা মুখে মাখলো। তারপর অনেক হিসাব-নিকাশ করে একটা উপায় বলল। ওর কথা মতো কাজ করলে নাকি একেবারে রক্তের মতো লাল ইট পাওয়া যাবে। ওঝা যে কাজটা করতে বলেছে সেটা এক কথায় ভয়াবহ। ওর দাবি, ভাটার ওপর খারাপ নজর আছে। সেটা কাটানোর জন্য একজন মানুষকে বলি দিতে হবে। দিয়ে কাটা মাথাটা পোড়াতে হবে ভাটার চুল্লিতে। তাহলেই ফাড়া কেটে যাবে।

ওঝা কথাটা শেষ করা মাত্রই আমি তাকে নিষেধ করে দিলাম। অনেক কষ্টে পাপের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আবার সেই পথে যেতে চাই না। কারও

রক্ত দিয়ে আমার ইটের রং লাল করার প্রয়োজন নেই। আমি তাকে এই মুহূর্তে চলে যেতে বললাম।

কিন্তু মরতু এসে আমাকে বাধা দিলো। ওঝার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে বলল। আরেকটা চালান ফেরত এলে আমাদের যে ব্যবসা বন্ধ করে ভিক্ষার বাটি হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে সেটাও স্মরণ করিয়ে দিলো। মরতু বলল, 'প্যাটের খিদার চাইতে বড় পাপ নাই। আগে খিদা মিটাইতে হবে। তারপর পাপ-পুণ্যের কথা ভাবা যাবে।'

আমি তখন মরতুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলি দিলেই যে ইটের রং লাল হবে তার গ্যারান্টি কি? যদি লাল না হয়?”

মরতু কিছু বলার আগে ওঝা বলল, 'তোমরা কিছু চিন্তা করমেন না, মণ্ডলের নাতি। ঝা করার মুই করিম। ইয়ার পরেও ইটা নাল না হইলে সউগ দোষ মোর। তোমার ছোরার নেচত মোর গলা পাতি দেইম। '

তখন আমার ওপর কী ভর করেছিল জানি না। ওঝার কথায় রাজি হলাম। মরতু আমাকে কোনো চিন্তা করতে নিষেধ করলো। মানুষ খুন তার কাছে ডালভাতের মতো ব্যাপার। হাত দুটো হারালেও তার রক্তে শিকারের পুরনো নেশা অটুট আছে

আমি সবকিছু মরতুর হাতে ছেড়ে দিলাম। জীবন নিয়ে অনেক জুয়া খেলেছি। এটাকেও আরেকটা জুয়া হিসেবে নিলাম। পরের দিন ভাটায় সারাদিন কাজ হলো। কয়েক হাজার ইট পোড়ানো হলো। কিন্তু ফলাফল শুন্য। ইটের রং লাল হলো না। হতাশায় আমার ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা।

তখনো জানি না মরতু কাকে বলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে জানি, যা হওয়ার আজ রাতেই হবে। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ।

শীতের রাত। খুব দীর্ঘ আর অন্ধকার। খেয়েদেয়ে বাড়িতে বসে সিগারেট টানছি এমন সময় মরতু খবর পাঠালো। ওঝা চলে এসেছে। একটু পরেই কাজ শুরু হবে। তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে বাইরে বেরুলাম। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। হিমেল হাওয়া গায়ের চাদর-মাফলার ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। কাঁপতে কাঁপতে একাই চলে গেলাম ভাটার

দিকে।

গিয়ে দেখি চুল্লির ওপর একটা বেদি বানানো হয়েছে। এখানেই বলি দেওয়া হবে। ভাটার ভেতর একটা ঘর আছে। সেখানে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি মরতু আর ওঝা মিলে গামছা দিয়ে একটা লোককে বেঁধে রেখেছে। লোকটা গোঙাতে গোঙাতে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা থাকায় বলতে পারছে না।

লোকটাকে চিনতে পারলাম। আমার ভাটাতেই কাজ করে। নাম মছিরউদ্দি। মছিরউদি একটু বোকা ধরনের মানুষ। 'সাদাভ্যাল্টা' হিসেবে সবাই তাকে চেনে। বুদ্ধি- সুদ্দি কম হলেও খুব খাটতে পারে। লোকটার একটাই দোষ, মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। কিছুদিন পর অবশ্য ফিরেও আসে। বাড়িতে কেউ নেই বলে চিন্তা করারও কেউ নেই। লোকটা একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেলেও কারো কিছু যায় আসে না ।

আমি আর ওঝা মিলে মছিরউদ্দিকে বেদির ওপর নিয়ে গেলাম। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বেচারা ছটফট করতে শুরু করলো। আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। কাটা হাত দিয়েই মরতু ওর পিঠে দুইটা কিল বসিয়ে দিলো। লোকটার চোখ দিয়ে তখন অঝোরে কান্না বেরোচ্ছে।

আমার তখন ভালো-মন্দের বোধ লোপ পেয়েছে। মাথা তখন একটাই চিন্তা, কীভাবে ইটের রং লাল করা যায়। এই লোকটার জীবনের বিনিময়ে যদি ব্যবসাটা

রক্ষা পায় তাহলে তাই সই।

আমি আর মরতু মিলে মহিরউদ্দিকে বেদিতে ঠেসে ধরলাম। কাঁধের ঝোলা থেকে বিরাট একটা ছোরা বের করলো ওঝা। কিছু মন্ত্র পড়ে মহিরের গলায় ছোরা চালিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। তিনজনে ভিজে গোসল হয়ে গেলাম। মহিরের শরীরটা কোরবানির গরুর মতো তড়পাতে শুরু করলো। আমরা ওকে ছাড়লাম না। ঠেসে ধরে থাকলাম। আস্তে আস্তে তড়পানি কমতে থাকলো। একটা সময় একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল।

আমরা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বডিটা চুল্লিতে ফেলে দিলাম। তারপর আগুন জ্বালিয়ে শেষরাত পর্যন্ত পোড়ালাম। ফজরের আজানের পর গোসল করে যে যার বাড়িতে চলে গেলাম। পরের দিন সকালে ভাটার কাজ স্বাভাবিকভাবে শুরু হলো। কেউ সন্দেহও করতে পারলো না রাতে এখানে কী ঘটে গেছে। শুধু এক শ্রমিক মহিরউদ্দির খোঁজ করেছিল। অন্যরা বলেছে মাথায় বায়ু চড়ে সে হয়তো কোথাও চলে গেছে। পাগল মানুষ কখন কি করে।

সেদিনের ব্যাচে আড়াই হাজার ইট পোড়ানো হলো। সকাল থেকে উত্তেজনায় ছটফট করছিলাম। লাল রঙের ইট পাবো তো? নাকি অযথা একটা লোককে খুন করলাম?

অপেক্ষার অবসান হলো বিকালে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে শ্রমিকেরা চুল্লি থেকে ইট বের করতে শুরু করলো। কাছে গিয়ে দেখি, ইট রক্তের মতো টকটকে লাল হয়েছে।

***

আলাউদ্দিন মণ্ডলের গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একেবারে থ হয়ে গেলাম। সন্দেহ নেই এটাই আজকের সবচেয়ে রোমহর্ষক গল্প। এটা তো কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। একেবারে খুন! সামনাসামনি কোনো খুনিকে আমি কোনোদিন দেখিনি। আমার সামনে বসে অনবরত সিগারেট টানতে থাকা লোকটাকে দেখে প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। ঘরের মেঝেতে শব্দ করে থুতু ফেললাম।

লোকটা অর্থাৎ আলাউদ্দিন মণ্ডলের কোনো ভাবান্তর নেই। সে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার মতোই বিস্ময়ে বিমূঢ়। সন্তোষ গুপ্ত তার চোখের চশমা খুলে গায়ের পাঞ্জাবিতে মুছলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনার ফাঁসি হওয়া উচিত। আপনি একটা অমানুষ।

নুরুন নাহার আর ছামেদুলের দিকে তাকিয়ে দেখি দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। তবে চোখে ধিক ধিক করছে নির্জলা ঘৃণা। আমি বললাম, 'আপনার সাহস তো কম না! এত বড় একটা অপরাধ করে এখন আবার বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন? আপনার মতো মানুষদের দেখলে ঘৃণা হয়।'

লোকটা আমার কথা শুনে একটু হাসলো। বাঁকা ঠোঁটের তাচ্ছিল্যের হাসি। তারপর বলল, 'দেখেন, আপনার বয়স কম। উত্তেজনা বেশি। আপনার মতো বয়সে আমারও উত্তেজনা বেশি ছিল। সারাজীবন তার খেসারত দিয়ে গেছি।'

লোকটা কথা শেষ করার আগেই আমি লাফিয়ে গিয়ে তার কলার চেপে ধরলাম । সঙ্গে সঙ্গে আওলাদ মিয়া ও অন্যরা এসে আমাকে জাপটে ধরে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। আমার মুখ দিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল বেরিয়ে এলো।

কী করব! এই লোকটা বেঁচে থাকার যোগ্য না। নরকে যাওয়ার জন্যই যেন এর জন্ম হয়েছে। আওলাদ আমাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলো। আমি কোনো কথাই শুনতে চাইছিলাম না। বারবার উঠে গিয়ে লোকটাকে মারার চেষ্টা করছিলাম। আলাউদ্দিন মণ্ডলের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে গোল গোল রিং ছাড়তে শুরু করলো।

আওলাদ মিয়া আমাকে বলল, 'শান্ত হন। এই লোকটা তার পাপের শাস্তি পেয়েছে। এই যে লোকটাকে দেখছেন টেনশন ফ্রি, এটা কিন্তু ওর আসল অবস্থা না লোকটা এই অপকর্মের যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। মানুষ খুন করে পার পাওয়া যায় না। সে পঁচিশ বছর জেল খেটে দুবছর আগে ছাড়া পেয়েছে। হ্যাঁ, যে পাপ সে করেছে সেজন্য ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তার জীবনটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে ইটভাটার জন্য কিছু করছে, তার ফল কী পেয়েছে? পায়নি।

আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতেই আওলাদ মিয়া আবারো বলতে শুরু করলো, ‘এদের ধারণা ছিল মহিরের দুনিয়ায় কেউ নেই। কিন্তু আসলে সেটা ঠিক না। বগুড়ার শেরপুরে মহিরের বউ আর দুই বাচ্চা ছিল। স্বামীর খোঁজে মহিলা এক মাসের মধ্যে গোবিন্দগঞ্জে চলে আসে। তারপর ব্যাপারটায় থানা-পুলিশ জড়িত হলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। বিচারে আলাউদ্দিন, মরতু আর ওঝা- তিনজনেরই যাবজ্জীবন জেল হয়। এদের মধ্যে মরতু আর ওঝা জেলেই মারা যায়। আল্লাহ আলাউদ্দিন মণ্ডলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য। ওর মরণ এতো সহজে হবে না।'

ফুল মিয়া সবার জন্য চা নিয়ে আসলো। রাত আস্তে আস্তে পোহাচ্ছে। সোয়া চারটা বেজে গেছে। আওলাদ মিয়া সবাইকে আবার টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ করলো। আমি এতোক্ষণ আলাউদ্দিন মণ্ডলের পাশে বসে ছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড ঘৃণায় আর লোকটার পাশে বসতে পারলাম না। আমার ও আওলাদ মিয়ার মাঝে যে লম্বা ছেলেটা বসেছিল তাকে অনুরোধ করলাম আলাউদ্দিনের পাশে বসতে। সে সরে বসলো। আমি গেলাম তার জায়গায়। আওলাদ মিয়া ছেলেটাকে অনুরোধ করলো গল্প শুরু করতে।

সাজ্জাদুল ইসলামের গল্প

আমার নাম সাজ্জাদুল ইসলাম নিশীত। বন্ধুদের কাছে নিশাত সাজ্জাদ নামেই বেশি পরিচিত। আমার বয়স সাতাশ। জন্ম ও বেড়ে ওঠা কুড়িগ্রাম শহরে। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগ থেকে মাস্টার্স করেছি। এখন সেখানেই এমফিল গবেষণা করছি।

আপনাদের প্রত্যেকের গল্প আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। আওলাদ ভাইয়ের সুবাদে বেশ কিছু অদ্ভুত গল্প শোনার অভিজ্ঞতা হলো। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

নিজের সম্পর্কে আমার খুব বেশি কিছু বলার নেই। আপনাদের জীবনে যেরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমার তাও নেই। খুব সাদামাটা জীবন আমার। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের কড়া শাসনে বেড়ে উঠেছি। তাঁদের একমাত্র সন্তান বলে চোখের আড়াল হতে পারিনি। শৈশব থেকেই আমার জীবনটা সরলরৈখিক আর খুব একঘেয়ে ।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে চান্স না পেয়ে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন আমার বাবা-মা খুব মুষড়ে পড়েছিল। আমার বাবা ছিলেন অর্থনীতির ছাত্র। এখন কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যাপক। আমি ফোকলোর পড়তে যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'বাবা, কমসে কম যদি অর্থনীতিতেও ভর্তির সুযোগ পেতি তাহলে আমার বুকটা ভরে যেত। তুই এমন একটা সাবজেক্টে চান্স পেলি যেটা পড়ে কোনো চাকরি পাওয়া যায় কী না সন্দেহ আছে। তুই এখন থেকে বিসিএসের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু কর।'

আমি সবসময়ই বাবা-মায়ের বাধ্যগত ছেলে। ভার্সিটির হলে ওঠার পরপরই গাইড কিনে বিসিএসের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিলাম। ক্লাসে যেতাম। কিন্তু ভালো লাগতো না। লোকসংস্কৃতি জিনিসটা ভীষণ গ্রাম্য একটা ব্যাপার মনে হতো। পড়ার কোনো আগ্রহ পেতাম না। এভাবেই প্রথম বর্ষ পার করি।

দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর আমার জীবনের মোড় বদল হয়। সেবারে আমি শিক্ষক হিসেবে পাই প্রফেসর ড. ওসমান গনিকে। তিনি আমাদের ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন পড়াতেন। বাংলার লোকজ উৎস থেকে এসবের জন্ম ইতিহাস জানতে জানতে কখন যে ফোকলোরের প্রেমে পড়ে যাই বুঝতেই পারিনি। স্যারের পড়ানোর ভঙ্গি ছিল চমৎকার। তেমনি অতুলনীয় তার পাণ্ডিত্য। তার ব্যক্তিত্ব আমাকে চুম্বকের মতো টানতো। পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্যারের সঙ্গে বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেছি। এরপর মনস্থির করি, জীবনে যদি কিছু করতে হয় তাহলে ফোকলোর নিয়েই করবো।

অনার্স-মাস্টার্সে প্রথম হওয়ার পর এমফিল গবেষণা শুরু করি। গবেষণার জন্য বেছে নেই ‘কামরূপী' সাহিত্যে প্রাচীন রঙ্গপুর এই বিষয়টিকে। কাজ করতে করতে জানতে পারি কুড়িগ্রামের রৌমারীতে এক স্কুল মাস্টারের সংগ্রহে বঙ্গকামরূপী ভাষায় লেখা কিছু পুঁথি আছে। খবরটা পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেলাম। ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা চর্যাপদের পর পূর্ব ভারতের ভাষাগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হবে। এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে যেগুলো সুনীতিকুমার-শহীদুল্লাহকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেরিয়েছে।

সেই পুঁথির খোঁজে দ্রুত রৌমারী যাই। সেখানে গিয়ে সত্যিই কিছু পুঁথি পাই। তবে এইগুলোকে যতটা প্রাচীন বলে দাবি করা হয়েছে, সত্যিই ততটা কীনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ নিয়ে এখনো গবেষণার প্রয়োজন আছে এবং সে গবেষণা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজ আপনাদের যে গল্পটা বলবো, সেটা এই পুঁথিরই একটা গল্প। পুরো গল্পটা কাব্যে লেখা। আমি আপনাদের জন্য সেটা গদ্য আকারে বলছি। গল্পটা এমন:

ঝোপের আড়ালে একটা দন্তীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিলে চমকে গেল কানুর। তেরো বর্ষার জীবনে এত কাছ থেকে কখনো দন্তীকে দেখেনি সে। একটা প্রকাণ্ড কুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে সে জন্তুটাকে দেখতে লাগলো।

মানুষের বড় শত্রু এরা। মিশকালো বিশাল শরীর। চলমান টিলার মতো বনের মধ্যে ছুটে বেড়ায়। ওদের শরীরের সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ হলো।

শুঁড়। আর কোনো জন্তুর বোধহয় শুঁড় জিনিসটা নেই। এই শুঁড় দিয়েই এরা খাঁড়ির পানি সাবাড় করে। টেনে নামিয়ে ফেলে সুপ্রাচীন গাছ। খ্যাপে গেলে শুঁড় মাথায় তুলে দুনিয়া কাঁপানো হুংকার দেয়। পুরুষ দন্তীগুলোর মুখের দুপাশে রাক্ষসের মতো বিকট দুটো দাঁত থেকে। একটাই সুখ, দন্তীরা মানুষ খায় না। ঘাস-পাতা আর খাঁড়ির ঘোলা জলেই ওদের যত রুচি। না খেলেও দন্তীর মানুষকে সহ্য করে না। মাঝে মাঝে গ্রামের ঝুপড়িগুলোতে আক্রমণ করে সব তছনছ করে দেয়। শুঁড়ের কাছে যাকে পায় তুলে আছাড় মারে। কখনো গোলায় জমানো ধান খেয়ে শেষ করে।

আরেকটা জিনিস দন্তীদের পছন্দ- মদ। কানু শুনেছে, ওর জন্মের কয়েক বছর আগে ওদের গ্রামে এমন একটা দন্তী খুব উৎপাত করছিল। ভাত পচিয়ে বানানো মদের লোভে প্রায়ই এসে হানা দিত এবাড়ি-বাড়ি। মদের হাঁড়িতে শুড় ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে মদ গিলে দাঁড়িয়ে থেকে ঢুলতো। শেষমেশ ওর বাবার নেতৃত্বে গ্রামবাসী একটা বল্লম দিয়ে উৎপাতটাকে বধ করেছিল। সেদিন থেকে ওর বাবার নামই হয়ে গেল দন্তীজিৎ।

কানু আজ জঙ্গলে এসেছিল টসটসে পাকা কুল পাড়তে। জঙ্গলের এদিকটায় প্রচুর কুল গাছ। বাঁদর আর বাদুড়দের খুব প্রিয় জায়গা। কানু যে খুব কুল ভালোবাসে তা নয়। তবে ওর মায়ের খুব পছন্দ। সেজন্যই জঙ্গলের এতটা ভেতরে আসা। মা জানলে অবশ্য এখানে একা আসতে দিতেন না। সারাদিন ছেলেকে তিনি চোখে চোখে রাখেন।

কানু মা-বাবার শেষ বয়সের সন্তান। ওর আর কোনো ভাই-বোন নেই। সেজন্যই মা জঙ্গলের সব ব্যাঘ্র-দন্তী-সর্প থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে চান। কিন্তু কানুর রক্তে আছে শিকারের নেশা। তাকে কী আর জঙ্গলের আহ্বান থেকে দূরে রাখা যায় ।

বাতাস উল্টোদিকে বইছে। দন্তীটা কানুকে দেখেনি। এদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর হয়। কিন্তু দৃষ্টি একেবারে যাচ্ছেতাই। নইলে কানুর রেহাই ছিল না। কানু ভালো করে দন্তীটাকে খেয়াল করে। একটা অল্প বয়সি দন্তী। ঝোপের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে কান আর লেজ নাড়িয়ে পোকামাকড় তাড়াচ্ছে। কানু এতদিন এদের দূর থেকে দেখেছে আর ভয় পেয়েছে।

ওদের গ্রামের অম্বুবান পুরোহিত প্রায়ই দিগগজের সন্তুষ্টির জন্য পূজা করেন। কানু শুনেছে, আটটি দন্তী পৃথিবীকে শূন্যে ধরে আছে। এরাই দিগগজ। নিচ থেকে পৃথিবীকে বইছে আরও চারটি দন্তী। এদের মধ্যে পূর্ব দিকের দন্তীটার নাম বিরূপাক্ষ। সে মাথা নাড়লেই ভূমিকম্প হয়।

ধর্মীয় ব্যাপারগুলো খুব ভালো মনে রাখতে পারে কানু। এজন্যই ওর : মায়ের ইচ্ছা ছেলে বড় হয়ে পুরোহিত হবে। ব্রহ্মপুত্রের চারিদিকে ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কানুর ভালো লাগে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে, গাছে চড়তে আর ছোট ছোট শিকার ধরতে।

দন্তীটা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট কুতকুতে চোখ থেকে খানিকটা অশ্রু গড়িয়েছে। বাচ্চা দন্তীটা কী কাঁদছে? ওর দলের অন্যরা কোথায়? অদম্য কৌতূহল ভর করলো কানুর মনে। সে কুলগাছের কাঁটা সাবধানে এড়িয়ে গাছের ওপরে উঠে বসলো ।

সেখানে একটা শালিকের বাসা। মা পাখিটা নিশ্চিন্তে বসে ডিমে তা দিচ্ছিলো। হঠাৎ একটা মানুষকে সেখানে উঠতে দেখে ফুরুৎ করে উড়ে পালালো। তারপর

চারপাশে ঘুরে ঘুরে কিচিরমিচির করতে লাগলো।

কানু ভয়ে ভয়ে দন্তীটার দিকে তাকালো। যদিও বাচ্চা দন্তী তবুও এদের বিশ্বাস নেই। অসুরের মতো শক্তি গায়ে। চাইলেই গাছে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলতে পারে। তারপর পায়ের চাপে থ্যাতলে মেরে ফেলতে পারে। কানু ভয়ে ভয়ে দিগগজদের ডাকে ।

শালিকের চ্যাঁচামেচিতে দন্তী সচকিত হয়। বড় বড় কানগুলো ইতিউতি ঘুরিয়ে শব্দের উৎস তালাশ করে। কানুর বুক ধুকপুক করে। হাত-পায়ের তালু এমনভাবে ঘামতে থাকে যেন মনে হয় পিছলে পড়ে যাবে। কিন্তু এখন পিছলে পড়া মানেই মৃত্যু। গাছের ফাঁকে শরীর লুকিয়ে দন্তীটাকে দেখতে থাকে কানু।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে দন্তীটা সামনে আসে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে কুলগাছের নিচে। মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে শুঁড় তুলে ডাকে। গাছের নিচে দন্তীটাকে দেখে কানুর হাত- পা কাঁপতে থাকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চলমান মৃত্যুদূতকে সে দেখতে থাকে ।

দন্তীটাকে ভালোভাবে দেখতেই তার নিঃসঙ্গতার কারণ বুঝতে পায় কানু জন্তুটার শরীরে অনেকগুলো তির বিঁধে আছে। আঘাতের জায়গা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। দন্তীটা তিরবিদ্ধ হওয়ার বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেছে বোধহয়। কারণ কয়েকটা জায়গায় রক্তও জমাট বেঁধে গেছে। বাচ্চা দন্তীটা অসহায়ের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। এভাবেই হয়তো দলের অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

কানু বুঝতে পারে এ কাদের কাজ। ব্রহ্মপুত্রের ওপারের খুকশিরা দন্তী শিকারে ওস্তাদ। ওদেরই হামলায় হয়তো আহত হয়েছে এটা। কানুরা দন্তীর মাংস খায় না। একেবারে বাধ্য না হলে হত্যাও করে না।

খুকশিরা একেবারে বর্বর জাত। কানুদের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মাঝে মাঝেই কানুদের গ্রামে আক্রমণ করে লুটপাটের চেষ্টা করে। ব্রহ্মপুত্রের পাড় থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় শিশু আর মেয়েদের। কানুদের গ্রামের বাচ্চারা দুষ্টুমি করলে ওদের খুকশিদের কথা বলে ভয় দেখানো হয়।

নরাধম খুকশিদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ আবার ওদের সর্দার শাকালু। লোকটার বাম চোখ নেই। একটা ভালুকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বাম কানও হারিয়েছে। কিন্তু তাতে সে মোটেই দুর্বল হয়নি। বরং তার নিষ্ঠুরতা আরো বেড়েছে। মোদ্দা কথা, লোকটার চেহারা যেমন বদখত তেমনই কুৎসিত তার কার্যকলাপ। শক্তি বাড়াতে সে নাকি বাচ্চাছেলেদের কাঁচা হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খায়। অবশ্য খুকশিদের কাছে এসবই ডাল-ভাত। পূজার নামে যারা মানুষ বলি দেয়, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

দন্তীটার দিকে মনোযোগ দেয় কানু। দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। হাজার হোক বাচ্চা তো, নিশ্চয়ই মায়ের জন্য মন খারাপ করছে। একটু খারাপই লাগে কানুর। কেন বাবা তোরা মানুষের বাড়ি-ঘর আক্রমণ করিস? হরিণ-বনগরুর মতো লতাপাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারিস না?

কানু জানে খুকশিরা কেবল মাংসের জন্য দন্তী শিকার করে না। দন্তীর চেয়ে বনগরু শিকার করা ঢের সহজ। দন্তীর মাংস কখনো খায়নি কানু। কিন্তু সেটা যে বনগরুর চেয়ে উপাদেয় হবে না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

খুকশিরা আসলে দন্তী শিকার করে গজমোতির লোভে। দন্তীদের মাথার ভেতরে নাকি এক ধরণের মোতি জন্মে যাদের গজমোতি বলে। রাতের অন্ধকারেও সে মোতি ঝকঝকে আলো ছড়াতে পারে। বাবার কাছে শুনেছে কানু, বজ্জাত শাকালুকে কোন এক সাধু নাকি বলছে, সে যদি গজমোতি এনে বাঁ চোখে স্পর্শ করে তাহলে আবারও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। সেজন্যই ব্রহ্মপুত্রের দুপাড়ে ওরা দন্তী শিকারের মচ্ছব শুরু করেছে। এক চোখ নিয়েই শাকালুর যা উৎপাত, দুচোখে দেখতে পেলে সে যে কী করবে কে জানে!

কুল গাছের ওপরে লুকিয়ে এসব ভাবছে কানু। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে একটা আহত বাচ্চা দন্তী। এমন সময় ঘটলো একটা অদ্ভুত ঘটনা। কানুর বাবার জন্মে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। সে শুধু পুরোহিত মশাইয়ের কাছেই এ ব্যাপারে শুনেছে। পৃথিবীর ভার বইতে বইতে ক্লান্ত বিরূপাক্ষ বিরক্ত হয়ে একটু মাথা নাড়ালো। মুহূর্তেই পৃথিবীসুদ্ধ আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। কী ভীষণ আলোড়ন সেটা! থর থর করে কাঁপতে লাগলো প্রকাণ্ড মহীরূহগুলো। বনের সব পক্ষী ত্রস্ত হয়ে আকাশজুড়ে ওড়াওড়ি শুরু করলো। হরিণ-ব্যাঘ্র-শৃগাল-কুকুর সবাই একযোগে ডেকে উঠলো। দিবানিদ্রা ভেঙে উড়ে পালালো প্যাঁচা আর বাদুড়ে। বিস্ময়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠতে শুরু করলো ব্রহ্মপুত্রের মৎস্য।

ভয়ে-আতঙ্কে নীল হয়ে কুলগাছ আঁকড়ে থাকতে চাইলে কানু। কিন্তু বিধাতার মনে ছিল অন্যকিছু। হাত পিছলে গাছ থেকে নিচে পড়ে গেল কানু। পড়বি তো পড় একেবারে বাচ্চা দন্তীটার পিঠে। কানু হঠাৎ পিঠে এসে পড়ায় দন্তীটা প্রথমে আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর ভয়ে-আতঙ্কে ছুটতে শুরু করলো দিকভ্রান্তের মতো।

বিরূপাক্ষের মাথা নাড়ানো থামেনি। ব্রহ্মপুত্রের তিরবর্তী এ অঞ্চলের অনন্ত কম্পন যেন ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে।

দন্তীর পিঠে পড়ার পর প্রথমেই কানুর মনে হয়েছিল সে বোধহয় মারা গেছে। কিন্তু সেটা ছুটতে শুরু করতেই তার হুশ ফিরে আসে। সংবিৎ ফিরে পেতেই সে জন্তুটার খসখসে অমসৃণ শরীর দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। নিচে পৃথিবীর প্রবল কম্পন আর পিঠে একটা দুপেয়ে বীভৎস জীব, দন্তীটা বেহুশের মতো ছুটতে শুরু করলো।

কম্পন যেন অনন্তকাল ধরে চলতে লাগলো। কানুকে পিঠে নিয়ে দন্তী ছুটতে ছুটতে এসে পড়লো ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ভয়ে-আতঙ্কে লাফিয়ে পড়লো নদের উচ্ছ্বসিত জলে।

কানু ভালো সাঁতার জানে। সমবয়সিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নদ এপার ওপার করতে পারে। কিন্তু এখনকার অবস্থাটা মোটেই স্বাভবিক নয়। একদিকে পৃথিবীর কম্পন অন্যদিকে দন্তী, জলে পড়ে কানুর হাত-পা অবশ হয়ে গেল। এক টুকরা নুড়ির মতো সে তলিয়ে যেতে লাগলো নদের উন্মত্ত জলে। ডুবে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো কানু। তার সঙ্গে সঙ্গে দন্তীটাও অসহায়ের মতো ডুবে যাচ্ছে। দন্তীরা জন্ম সাঁতারু, খুব ভালো করে জানে কানু। কিন্তু সেটাও এখন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। কানুর মতোই এগিয়ে যাচ্ছে অমোঘ মৃত্যুর দিকে

কানুর যখন দম একেবারেই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। তার শরীর প্যাঁচিয়ে ধরলো কিছু একটা। মৃত্যু দেবতার স্পর্শ ভেবে শরীর এলিয়ে দিলো কানু। তার বারবার মনে পড়তে লাগলো মা-বাবার মুখ। সবুজ বনের পাশে তাদের শান্ত কুটির, খুঁনসুটিতে মেতে থাকা খেলার সাথিদের কথা। বিদায়!

অজ্ঞান হওয়ার আগে কানু বুঝতে পারলো সে জলের ওপর ভেসে উঠেছে। কীসে যেন তাকে টেনে তুলেছে। তারপর তলিয়ে গেল সংজ্ঞাহীন ঘুমে।

কতক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরলো কানু জানে না। জ্ঞান ফিরতেই সে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে গেল। সে বেঁচে আছে। ততক্ষণে ধরণির তাণ্ডব একেবারে থেমে গেছে। খানিক আগের ভয়াবহ কম্পনের পর আবার শান্তি নেমে এসেছে জঙ্গলের বুকে। আতঙ্ক ভুলে প্রাণীরা নিজেদের কাজে মন দিয়েছে। পাখিরা ফিরেছে গাছে। অন্ধকারে আবার চোখ মুদেছে ঘুমকাতুরে নিশাচরেরা। কানুর খেয়াল হলো তাকে এখনই বাড়িতে ফিরতে হবে। দুশ্চিন্তায় তার মা নিশ্চয়ই উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

কয়েক পা এগিয়েই সে দেখতে পেল দন্তীটাকে। একটা কাঁঠালগাছের আড়ালে লুকিয়ে তাকে দেখছে। শরীর ভিজে চিমসে হয়ে গেছে। ভেজা শরীরেও নতুন করে ফুটে উঠেছে অশ্রুর দাগ।

কানু বুঝতে পারলো দন্তীটাই তার জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু কেন? ওর দুর্দশার জন্য তো মানুষই দায়ী। তাদেরই একজন কে সে কেন বাঁচাতে গেল? কানু জানে দন্তীরা খুব একরোখা জন্তু। মানুষের পোষ মানে না। ধারে কাছে মানুষকে পেলেই আছড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। মানুষও মাংসের লোভে, কখনও গজমোতির লোভে এদের হত্যা করে। কিন্তু তারপরও এই দন্তীটা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার জীবন বাঁচিয়েছে। কানু দন্তীটার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেটা যে ওকে মারবে না, সে বুঝে গেছে ।

কানুকে আসতে দেখে দন্তীটা নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে প্রাণীটার শরীরে হাত দিলো। মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। দন্তীটা বার কয়েক চোখ পিট পিট করে সাড়া দিলো। ওর শরীরে বিধে থাকা তিরগুলো খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো কানু। প্রতিটা তির ধরে হ্যাঁচকা টান দিতে শুরু করলো। জঙ্গল কাঁপিয়ে আর্তনাদ করতে থাকলো যন্ত্রণাকাতর দন্তীটা।

পাঁচ বর্ষা পর

প্রচণ্ড আক্রোশে কানুদের গ্রাম আক্রমণ করেছে খুকশি। একটা গদা বাগিয়ে সবার আগে ছুটে আসছে সর্দার শাকালু। লোকটার এক চোখে বিকটভাবে ফুটে আছে লালসা, অন্য চোখে মৃত্যুর শূন্যতা। নরক থেকে নেমে আসা কীট যেন।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। দলপতিকে দেখে থেমে গেল অন্যরাও। সামনে এগোবে কি না তা নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছে।

জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসছে একটা প্রকাণ্ড পুরুষ দন্তী। তার পিঠে বসে আছে একটা মানুষ।

এ কী করে সম্ভব! এ কী বাস্তব, না মায়া? মানুষের সঙ্গে দন্তীর কখনো দোস্তি হয়? একগুয়ে জন্তুটাকে কোন মন্ত্রবলে বশ করলো লোকটা?

বিস্ময়ে-আতঙ্কে ওরা কয়েকবার চোখ কচলালো। তারপর উল্টোদিকে ছুটে পালালো। দন্তীর পিঠে বসে বিজয়ের উল্লাস করতে লাগলো কানু।

***

চমৎকার গল্প সন্দেহ নেই। হাতি এমন একটা প্রাণী যা কখনো মানুষের পোষ মানে না। তবে তাকে বশ মানানো যায়। প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলেন, এই ভারতবর্ষেই হাতিকে প্রথম বশ করেছিল মানুষ। সেদিক থেকে এই গল্পটা অনেক কৌতূহলের উদ্রেক করে।

আওলাদ মিয়া ঘড়ির দিকে তাকায়। বলে, 'আজান হইতে বেশি দেরি নাই। আমরা বরং পরের গল্পে চলে যাই।'

পরের গল্প মানে আমার পালা। এবার আমার খানিকটা অস্বস্তি হতে শুরু করে। শীতের মধ্যেও শরীর ঘামে ভিজে যায়। যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা কাউকে কখনো বলা হয়নি। আমার পরিবারের কেউ তো বটেই, ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও এই ঘটনার ব্যাপারে জানে না। কিন্তু গল্পটা আজ আমাকে বলতেই হবে। ভারমুক্ত হওয়ার জন্য এরচেয়ে ভালো সময় আর হয় না। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলাম।

অরিন্দম দে'র গল্প

আমার নাম অরিন্দম দে। বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে। সেখানেই বড় হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে অনার্স-মাস্টার্স করেছি। দর্শন পড়েছি বলে নয়, ছোটবেলা থেকেই আমার ভেতর যুক্তিবাদীতার ভাব প্রবল। যেকোনো বিষয় আমি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি। কখনো সফল হই, কখনো হই না ।

আজ আপনাদের যে গল্পটা শোনাতে যাচ্ছি সেটাকে কোনো যুক্তিতেই বিশ্লেষণ করতে পারিনি। একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ হিসেবে ব্যাপারটা আমার জন্য খুবই অস্বস্তিকর। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমি গল্পের চরিত্রদের নাম বদলে দিচ্ছি।

আমি একটু নরম মনের মানুষ। কারও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারি না। ছোটবেলায় বাসায় কেউ ভিক্ষা করতে এলে চাল এনে দিতাম। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে অতটুকু অবস্থাতেই অনেককে সাহায্য করেছি। ছোট কাকা এজন্য আমার নাম দিয়েছিল 'ফাদার তেরেসা' বাড়ির সবাই এই নামে ডেকে আমাকে খ্যাপাতো।

বড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ঢাকায় এলাম। জগন্নাথ হলে উঠলাম। এখানে এসে পড়াশোনা, আচ্ছা এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তবে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বছরে তিন চারবার রক্ত দিতাম। আমার রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ। সেজন্য রক্ত চেয়ে অনেকেই ফোন করতো।

সেদিনের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। সামনে সেমিস্টার ফাইনাল, সেজন্য রিডিং রুমে রাত জেগে পড়াশোনা করি। রাত

বোধহয় তখন আড়াইটা বাজে, সিগারেট খেতে বাইরে বেরিয়েছি এমন সময় সংগঠনের এক বড় ভাই ফোন করলো। বলল, 'রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, জরুরি ভিত্তিতে বি-নেগেটিভ রক্ত লাগবে। তুমি তাড়াতাড়ি ঢাকা মেডিকেলে চলে আসো।'

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। বেশ ঝড়ো বাতাস বইছিলো। হলের সামনের বড় গাছগুলো বারবার দুলে উঠছিল। কয়েকটা কাক এস্ত হয়ে অবেলায় কা কা করে ডাকতে শুরু করেছিল। খোলা জানালাগুলো দুদ্দাড় করে একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিলো। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এতে বাইরে যেতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তাছাড়া সিলেবাসের অনেকটাই বাকি। আজ রাতে যতটুকু পড়ার কথা ছিল তার অর্ধেকও শেষ করতে পারিনি। কিন্তু বড় ভাইকে এসব কে বোঝাবে। তিনি আছেন আশঙ্কাজনক রোগীকে নিয়ে। আমার সুবিধা-অসুবিধা বোঝার সময় তার নাই ।

সংগঠন করতে গেলে এই এক বিপদ, সময়-অসময় নেই ফোন করে বসবে। না গেলেও বিপদ, পরের দিন হাঁড়ির মতো মুখ করে এসে বলবে, ‘রোগীটার অবস্থা খুব সিরিয়াস ছিল অরিন্দম। তুমি একটু কষ্ট করলে তার মুখে হাসি ফুটতে পারতো। মানুষ মানুষের জন্য, এই কথাটা কেন যেন সবাই ভুলে যাচ্ছে।'

একরাশ বিরক্তি নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। জরুরি বিভাগের গেটে গিয়ে দেখি সায়েম ভাই দাঁড়িয়ে আছে। ইনিই আমাকে ফোন করেছিলেন। আমাকে দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসলেন। বললেন, ‘রোগীর অবস্থা ক্রিটিক্যাল, অরিন্দম। এখন ওটিতে আছে। তাড়াতাড়ি চলো।'

ওটির সামনে গিয়ে দেখি কোনো জটলা নেই। সায়েম ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘রোগীর আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে নাই?”

উনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর চোখ থেকে রিমলেস চশমা খুলে শার্টের কাপড়ে মুছে বললেন, 'মেয়েটাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পড়ে ছিল। সম্ভবত রেপ কেস।'

'পুলিশে খবর দিছেন?'

'হ্যাঁ। লালবাগ থানায় জানাইছি কিন্তু ওরা শাহবাগ থানায় যাইতে বলছে। ঘটনাস্থল নাকি শাহবাগ থানার আন্ডারে। ওখানে খবর পাঠাইছি।'

নার্স এসে আমাদের ডাকলো। এক্ষুণি রক্ত লাগবে। আমি নার্সের সঙ্গে গিয়ে রক্ত দিলাম।

বের হয়ে দেখি সায়েম ভাই একাই বসে আছেন ওটির সামনে।

আমাকে দেখে শুকনা মুখে হাসলেন। বললেন, 'চলো তোমাকে একটা জুস খাওয়াই।'

'দরকার নাই ভাই। আপনি রাতে কিছু খাইছেন?

'সময় পাই নাই। কাউকে তো পাইলাম না। এদিকে কখন কী লাগে। তাছাড়া খিদাও নাই।”

'কী বলেন? সারারাত কি না খেয়ে থাকবেন নাকি? চলেন চানখাঁর পুলে গিয়ে তেহারি খেয়ে আসি। '

‘না, ভাই। তুমি যাও। তোমাদের তো সামনে সেমিস্টার ফাইনাল। দেখছো, আমার একদম মনে ছিল না। তুমি বরং গিয়ে রেস্ট নাও।'

'সে না-হয় নিলাম। আপনি এখন কী করবেন?”

‘এখানেই থাকবো। ভোর হোক। হল থেকে কয়েকজন আসবে। ওরা এলেই চলে যাব।'

সায়েম ভাইকে নিয়ে এই এক বিপদ। মানুষের কষ্ট দেখলে ঠিক থাকতে পারেন না। পৃথিবীতে এ রকম মানুষ আরো অনেক প্রয়োজন।

ঠিক করলাম ভোর পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকে যাব। সারারাত আমরা ওটির সামনে বসে থাকলাম। সায়েম ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিলে অনেক কিছু শেখা যায়। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি অনেক কিছুতেই তার বিচরণ। কীভাবে যে সময় কেটে গেল টেরই পেলাম না।

সকাল বেলা আমাদের সংগঠনের কয়েকজন ছেলে চলে এলো। একটু পর পুলিশও এলো। ততক্ষণে অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। ওটি থেকে মেয়েটাকে আইসিইউতে পাঠানো হয়েছে। জ্ঞান ফেরার লক্ষণ এখনো দেখা যায়নি। ডাক্তার বললেন, আপনারা ভেতরে গিয়ে রোগীকে দেখে আসতে পারেন।

আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। রক্ত তত দিয়েছি, এখন কোনমতে হলে ফিরে যেতে পারলেই বর্তে যাব। কিন্তু সায়েম ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে না গিয়ে পারলাম না। পুলিশদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম আমি আর সায়েম ভাই।

কেউ কি কখনো আইসিইউয়ের ভেতরে গেছেন? জায়গাটা আমার কাছে খুব ভীতিকর মনে হয়। প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এখানে যমে মানুষের টানাটানি চলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যমই জয়ী হয়।

কালেভদ্রে কিছু মানুষ প্রিয়জনদের আনন্দে ভাসিয়ে এই যমালয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে সেটা খুব বিরল ঘটনা।

বারো নাম্বার বেডে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে আমাদের রোগী। মুখের ভেতর একটা নল ঢুকানো। মাথার পেছন দিকে অনেকগুলো মনিটরে কী সব তথ্য দেখাচ্ছে। বিপ বিপ করে চারপাশ থেকে এমন একটা রব উঠেছে যেটাকে মন দিয়ে শুনলে রাতচরা পাখির হাড়হিম করা ডাক বলে ভুল হয়।

মেয়েটার বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। দুই চোখের পাতা ফুলে ঢুল হয়ে আছে। চোখ দুটো অর্ধেক খোলা। বাম চোখের কোণে মুক্তার মতো চিকচিক করছে এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। নল ঢুকানোর কারণে মুখ হাঁ হয়ে আছে। দুই ঠোঁট শুকিয়ে কিশমিশের মতো হয়ে গেছে। উপরের ঠোঁটে আঘাতের চিহ্ন আর কপালের ওপর একটা শুকনো কাটা দাগ ছাড়া নির্যাতনের আর কোনো চিহ্ন নেই।

মনে হচ্ছে মার ওপর রাগ করে ঠোঁট ফুলিয়ে ঘুমিয়ে আছে এক অভিমানী রাজকন্যা। মেয়েটা অনিন্দ্য সুন্দরি। মৃত্যুশয্যায় মানুষের শরীর থেকে নাকি লাবণ্যের প্রতিটা বিন্দু দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটার শরীর থেকে লাবণ্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমি তার থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না।

পুলিশের কাছে নাম-ঠিকানা দিয়ে আমি ও সায়েম ভাই হলে চলে এলাম। সারা রাত জেগে ছিলাম। এসেই লম্বা একটা ঘুম দিলাম। সেদিন খুব অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম আমি।

দেখি আমি ও মেয়েটা ট্রেনে করে কোথায় যেন যাচ্ছি। মেয়েটা জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে। দূরে আবছা পাহাড়ের ছায়া দেখে বুঝলাম আমরা চট্টগ্রামে যাচ্ছি। মেয়েটার চোখে মুখে শিশুর মতো কৌতূহল। যা দেখছে তাতেই অভিভূত হচ্ছে। লোকালয়ের পর সবুজ প্রান্তর দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। জলাভূমির ওপর উড়ন্ত মাছরাঙ্গা দেখে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে ঘন হয়ে আসা দূরের গ্রাম দেখাচ্ছে। চমৎকার সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

এমন সময় ঘটলো অঘটন। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ পাথর ছুড়ে মারলো। পাথরটা এসে লাগলো একেবারে মেয়েটার মাথায়। ঠক করে একটা শব্দ হলো। মুহূর্তে তার মাথা ফেটে গেল। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগলো। মাথা চেপে ধরে মেয়েটা কামরার মেঝেতে পড়ে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম, এই ট্রেন থামান। কেউ চেন টানেন। শায়লাকে হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলো না। সবাই যার যার জানালার ঝাঁপ ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আমি নিজেই চেনের খোঁজে বগির পর বগি দৌড়াতে লাগলাম। কোথাও চেন নেই। সামনের দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম, ইঞ্জিন রুমের দিকে। সেখানে গেলে অন্তত ড্রাইভারকে বলে ট্রেন থামাতে পারবো। কিন্তু যতই দৌড়াই বগি আর শেষ হয় না। মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ের সবকটা ট্রেন একসাথে জোড়া লাগানো হয়েছে।

উপায় অন্তর না দেখে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলাম। কাঁদছি আর দৌড়াচ্ছি, ‘এই ট্রেন থামান। শায়লার মাথা ফেটে গেছে, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে । বাঁচান, কেউ সাহায্য করেন, প্লিজ!'

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা পাথর এসে আমার মাথায় লাগলো। আমি মাথা চেপে ধরে পড়ে গেলাম। কী ঘটছে কয়েক সেকেন্ড বুঝতেই পারলাম না। সংবিৎ ফিরতেই উঠে বসলাম। রক্তে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা শরীর। দেখি মেয়েটা

চিৎকার করে কাঁদছে, 'এই ট্রেন থামান। কেউ চেন টানেন। অরিন্দমের মাথা ফেটে গেছে, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে।'

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো মেয়েটা সম্পূর্ণ অক্ষত। একটু আগের আঘাতের কোনো চিহ্নই নেই। মনে হলো ঢিল তাকে লাগেনি, আমাকে লেগেছে। আগের ঘটনাটা ঘটেইনি। আমি কল্পনা করে নিয়েছি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়বো কী? সারাক্ষণ মেয়েটার কথা ভাবতে লাগলাম। স্বপ্নযোগে মেয়েটার নামও জানতে পেরেছি, শায়লা। শায়লা, শায়লা, শায়লা। নামটা মাথার ভেতর বারবার অনুরণন তৈরি করতে লাগলো।

সন্ধ্যার দিকে আমি মেডিকেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আইসিইউতে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সায়েম ভাই নিশ্চয়ই অন্য কোনো অসহায় মানুষের হদিস পেয়েছে। তার সেবা করতে চলে গেছে। অবশ্য আইসিইউতে রোগীকে রাখলে কারও কিছু করার থাকে না। যা করার হাসপাল কর্তৃপক্ষই করে। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে আমি মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ‘কে তুমি? কে তোমাকে এত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করলো ?

অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। মনে মনে মেয়েটাকে শায়লা বলে ডাকলাম। অনেক আদুরে স্বরে ডাকলাম। মেয়েটা যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবেই রইলো। তার মাথার পেছনের মনিটরগুলো ধুকে ধুকে জীবনের সংকেত দেখাতে লাগলো।

আইসিইউতে ভিজিটরদের বেশিক্ষণ থাকার নিয়ম নেই। ডাক্তারের তাড়ায় খানিকবাদে বেরিয়ে এলাম।

নিশ্চয়ই মেয়েটার বাবা-মা আছে, ভাই-বোন আছে। সে নিশ্চয়ই কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তার নিশ্চয়ই অনেকগুলো বন্ধু আছে। সবাই মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়ই। হন্যে হয়ে খুঁজছে। আচ্ছা, মেয়েটার কি প্রেমিক আছে?

ওর শুকনো ঠোঁটে কেউ কোনোদিন চুমু খেয়েছিল কি? ভাবনাটা মাথায় আসতেই বিষাদে মনটা ভরে গেল। এমন কেউ থাকলে আমি মেনে নিতে পারবো না। এই দুই দিনের দর্শনে আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি।

হলে ফিরে রিডিং রুমে ঢুকলাম। দুদিন পর পরীক্ষা। সিলেবাস শেষ করতে না পারলে মুশকিলে পড়বো। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পড়লাম। পড়া শেষ করে পলাশী গিয়ে ডিম-পরোটা খেলাম। তারপর হলে ফিরে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে ফেসবুক ব্রাউজ করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। লগইন করতেই একটা ছোটোখাটো ধাক্কা খেলাম। শায়লা নামের একজন আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। প্রোফাইল পিকে আইসিইউতে শুয়ে থাকা মেয়েটার ছবি।

কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ফাজলামি করছে। খুব নিষ্ঠুর রসিকতা। একটা মরণাপন্ন মেয়ের নামে প্রোফাইল খুলে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করার চেষ্টা করছে। রাগে-ঘৃণায় আমার গা গুলিয়ে উঠলো। মানুষ কীভাবে এত নিচে নামতে পারে? কে এই রিকোয়েস্টটা পাঠালো? নিশ্চয়ই আমাদের সংগঠনের কেউ। মেয়েটাকে রক্ত দিয়েছি এটা ওরা ছাড়া কেউ জানে না। সকালে যারা এসেছিল তাদের কেউ হবে। আসিফ, ইমতিয়াজ, সুবীর, আদনান-এদের মধ্যে কে?

আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো। সায়েম ভাই নয়তো? উনি হয়তো আইসিইউতে আমার হাবভাব লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু সায়েম ভাইয়ের মতো নিপাট ভদ্রলোক, নির্বিবাদী মানুষ এই কাজ করতে পারেন আমার বিশ্বাস হলো না। কিন্তু আমাকেই কেন রিকোয়েস্ট পাঠালো? মেয়েটার প্রেমে পড়েছি, সে কথা তো কাউকে বলিনি। না বললেও কেউ হয়তো বুঝতে পেরেছে। এখন আমার সঙ্গে মজা নিচ্ছে। রাগে-ঘৃণায় রিকোয়েস্টটা ডিলিট করে দিলাম।

কী অদ্ভুত মানুষের মানসিকতা! কী নিষ্ঠুর মানুষের রসিকতা! মৃত্যুর দুয়ারে থাকা একটা মেয়েকে নিয়ে এসব ফাজলামি করার কথা কেউ চিন্তা করে কীভাবে? নেট অফ করে ঘুমাতে গেলাম ।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। শেষ রাতে আরেকটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আমি আইসিইউতে অচেতন হয়ে শুয়ে আছি। মুখে নল লাগানো। মাথার পেছনে চারকোনা মনিটরে বিদঘুটে কিছু রেখা ওঠানামা করছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সায়েম ভাই ও শায়লা। আমি খুব বলার চেষ্টা করলাম, 'আমার কী হয়েছে? আমি হাসপাতালে কেন?' কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। মনে হলো আমাকে বোবায় ধরেছে। নড়াচড়া করার চেষ্টা করে দেখলাম আমার পুরো শরীর অবশ।

সায়েম ভাই স্বাভাবিকভাবে শায়লার সঙ্গে কথা বলছে, ছেলেটাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাওয়া গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। সম্ভবত কেউ ওকে উদ্যানে ফেলে গেছে।

আমার যেন মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটলো। এটা তো শায়লার বেড। কেউ ওকে নির্যাতন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফেলে গেছে। ওকে আমি গতকাল রক্ত দিয়েছি। কিন্তু ওর জায়গায় আমি গেলাম কীভাবে?

চিৎকার করে বললাম, সায়েম ভাই। আমি অরিন্দম। আমাকে চিনতে পারছেন না? এই মেয়েটাকে রক্ত দিতে কালকে আমাকে ডেকেছিলেন। ওর জায়গায় আমি গেলাম কীভাবে? সায়েম ভাই, এসব কী হচ্ছে? আমাকে বাঁচান। প্লিজ।

আমার চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। সায়েম ভাই আর মেয়েটা পুলিশের কাছে নাম-ঠিকানা দিলো। তারপর চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিলো। যেতে যেতে মেয়েটা একবার আমার দিকে তাকালো। তার দুই চোখে আমার জন্য গভীর মমতা।

ঘুম ভেঙে গেল। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। যাক, যা দেখলাম সেটা সত্যি সত্যি ঘটেনি। রাত তখনো পোহায়নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেও আর ঘুম এলো না

। বালিশের কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে ফেসবুকে লগইন করলাম। নোটিফিকেশন চেক করতে গিয়ে দেখি নতুন একটা মেসেজ এসেছে। শায়লা পাঠিয়েছে।

রাগে-বিরক্তিতে আমার মেজাজ খিচড়ে গেল। ইনবক্স খুলে দেখি লিখেছে, 'প্লিজ এক্সেপ্ট মাই রিকোয়েস্ট।'

আমি কিছুক্ষণ থ মেরে থাকলাম। ভুল হয়েছে, রিকোয়েস্ট ডিলিট না করে আইডিটা ব্লক করা উচিত ছিল। এবার আর ভুল করবে না। অনেক হয়েছে আমার ইমোশন নিয়ে খেলা। আইডিটা ব্লক করতে যাব এমন সময় আবারো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এলো। ভাবলাম একটু বাজিয়ে দেখি, ফাজলামিটা কে করছে সেটা হয়তো ধরতে পারবো।

রিকোয়েস্ট এক্সেপ্ট করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আইডি থেকে মেসেজ আসলো,

‘থ্যাংকস'।

আমি লিখলাম, কে বলছেন জানতে পারি?

একটা মুচকি হাসির ইমো এলো। বলল, ‘আমাকে আপনি ভালো করেই চেনেন। আপনার রক্ত আমার ধমনীতে বইছে। বেঁচে আছি আপনার জন্য।'

‘সেটা তো বুঝছি। অজ্ঞান একটা মেয়ের নামে আইডি খুলে ফাজলামি করছেন।

‘আমি মোটেই ফাজলামি করছি না। আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে।'

'হাস্যকর কথা! ফাজলামি ছাড়া আর কী? আপনি বলতে চাইছেন কোমায় থেকে আপনি ফেসবুকে লগইন করেছেন? ইতরামির একটা লিমিট আছে।'

‘শায়লা। আমার নাম শায়লা।' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এখানে বাক্যব্যয়

অন্যপ্রান্ত থেকে মেসেজ এলো, আমি জানি কথাগুলো আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও বলি, পরশু রাত থেকে আমি অজ্ঞান হয়ে আছি। আমার শরীর অচল হয়ে গেলেও মগজ সচল আছে। আমি জানি আপনি আমাকে রক্ত দিয়েছেন। আপনার নাম অরিন্দম।

এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আমার নাম কী করে জানলেন?

‘আইসিইউয়ের ভেতরে আপনারা কথা বলছিলেন, তখন শুনেছি।' ‘এখন দয়া করে বলবেন কী কোমায় থেকে কীভাবে ফেসবুকে ঢুকেছেন? আমার সঙ্গে কী করে চ্যাটই বা করছেন?

“আমি ঠিক জানি না। সেদিন আপনারা চলে যাওয়ার পর আমার খুব একা লাগতে শুরু করে। আইসিইউয়ের পরিবেশ একেবারে দমবন্ধ করে দিয়েছিল। সুস্থ মানুষেরই এখানে ভালো লাগার কথা নয়, আর আমি তো অর্ধমৃত। সে সময় খুব বাঁচতে ইচ্ছা করছিল। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিলো। অন্তত আমাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের পরিচয় জানাতে ইচ্ছা করছিলো।

তারপর?

'তারপর কী হলো জানি না। মাথাটা কেমন যেন চক্কর দেওয়া শুরু করলো। মাথার পেছনের যন্ত্রগুলোর বিপ বিপ আওয়াজ তীব্র হলো। নার্সরা ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। এমন সময় সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল। আমি চেতনা হারিয়ে ফেললাম। এক রকম মারাই গেলাম।”

'আচ্ছা?'

‘চেতনা ফেরার পর দেখি চোখের সামনে একটা নীল পর্দা ঝুলছে। আপনার কথা ভাবতেই পর্দার ওপরে আপনার ফেসবুক প্রোফাইল চলে এলো। আমি ভাবলাম দারুণ তো! তারপর সায়েম ভাইয়ের কথা ভাবতেই তার প্রোফাইল চলে এলো। তারপর ভাবলাম আমার বোন জিনিয়ার কথা, মুহূর্তেই ওর প্রোফাইল চলে এলো, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই নিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে। একে একে আমার কাছের মানুষদের কথা ভাবতেই তাদের প্রোফাইল দেখতে পেলাম। সবশেষে দেখলাম সেই মানুষটার প্রোফাইল, যে আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নীল পর্দাটা অন্ধকার হয়ে গেল।

নিলেন?”

‘আপনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন। আমাকেই কেন বেছে

একটা স্মিত হাসির ইমো এলো। শায়লা লিখলো, 'চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। শুধু আপনাকেই মেসেজ পাঠাতে পারছি। অন্য কাউকে নয়।

'আপনি আমার কাছে কী চান?

‘দেখুন, আমি আর বাঁচবো না। হয়তো দুয়েকদিন, তারপর যেতে হবে। মৃত্যুর আগে আপনাকে কিছু কথা বলে যেতে চাই। যে লোকটার কারণে আমার এই অবস্থা তার পরিচয় জানাতে চাই। আমি চাই, সে তার পাপের শাস্তি পাক।'

মেয়েটার কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আবার একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। আমি লিখলাম, আপনার এই অবস্থা কে করেছে?

‘আমার পরিচিত একজন। জানোয়ারটা একসময় আমার প্রাইভেট টিউটর ছিল। আমাকে ম্যাথ পড়াতো।'

‘ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন?”

‘ক্লাস নাইন থেকে আমি লোকটার কাছে পড়তাম। ঢাকার নামকরা একটা স্কুলের শিক্ষক। শুরুতে ভালোই পড়তো। আমি ম্যাথসে দুর্বল। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ভালো করলাম। ধীরে ধীরে লোকটার আসল রূপ বেরিয়ে এলো। সে আমার শরীরে হাত দিতে শুরু করলো। আমি প্রতিবাদ করলে লোকটা আমাকে শাসাত। বলতো, এর ফল ভালো হবে না।'

‘আপনার বাবা-মাকে কিছু বলেননি কেন?”

'আপনি আমার কাছে কী চান?

‘দেখুন, আমি আর বাঁচবো না। হয়তো দুয়েকদিন, তারপর যেতে হবে। মৃত্যুর আগে আপনাকে কিছু কথা বলে যেতে চাই। যে লোকটার কারণে আমার এই অবস্থা তার পরিচয় জানাতে চাই। আমি চাই, সে তার পাপের শাস্তি পাক।'

মেয়েটার কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আবার একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। আমি লিখলাম, আপনার এই অবস্থা কে করেছে?

‘আমার পরিচিত একজন। জানোয়ারটা একসময় আমার প্রাইভেট টিউটর ছিল। আমাকে ম্যাথ পড়াতো।'

‘ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন?”

‘ক্লাস নাইন থেকে আমি লোকটার কাছে পড়তাম। ঢাকার নামকরা একটা স্কুলের শিক্ষক। শুরুতে ভালোই পড়তো। আমি ম্যাথসে দুর্বল। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ভালো করলাম। ধীরে ধীরে লোকটার আসল রূপ বেরিয়ে এলো। সে আমার শরীরে হাত দিতে শুরু করলো। আমি প্রতিবাদ করলে লোকটা আমাকে শাসাত। বলতো, এর ফল ভালো হবে না।'

‘আপনার বাবা-মাকে কিছু বলেননি কেন?”

তারপর?

‘এভাবে ভয়-আতঙ্কের মধ্যে আমি এসএসসি পাশ করলাম। কলেজে ভর্তি হলাম। লোকটা তখনো আমার পিছু ছাড়েনি। ব্যাপারটা আমার বাবাকে বলি। বাবা পুলিশকে জানান। তারপর কিছুদিন লোকটাকে আর দেখিনি। ভেবেছিলাম সে আমাকে আর বিরক্ত করবে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে আমার ভুল ভাঙে। লোকটা আবার আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করে।

তারপর আবার পুলিশে খবর দিলেন?

না। সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। গত পরশুদিন বিকালে রিকশা করে কলেজ থেকে ফিরছিলাম, সে রাস্তায় আমার রিকশা আটকে ফেলে। টেনে হিঁচড়ে আমাকে একটা মাইক্রোবাসে উঠিয়ে যাত্রাবাড়ির একটা বাসায় নিয়ে যায়। তারপর তার তিন সঙ্গী মিলে আমাকে ধর্ষণ করে। ওদের নিপীড়নে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরের ঘটনা আপনি জানেন।

‘কী ভয়াবহ ব্যাপার।' ‘আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন?”

'বলুন।’

‘আমার হাতে সময় বেশি নেই। আপনি দয়া করে আমার বাসায় খবর দিতে পারবেন?'

নিশ্চয়ই। 'আমার বাসা মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায়। বাবার নাম আবদুল কাদের ভূঁইয়া।

সকালের নাস্তা করে চৌধুরীপাড়ায় আবদুল কাদের ভূঁইয়ার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। শায়লার বাবা-মা ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে এলাম। আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর শায়লা মারা গেল।

সে হৃদয় বিদারক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নাই বা দিলাম ।

পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলছি, শায়লার নিপীড়ক কামরান আলীকে তিনজন সঙ্গীসহ গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালত তাদের ফাঁসির রায় দিয়েছে। আশা করা যায় খুব শিগগির রায় কার্যকর করা হবে। সেদিনের পর শায়লার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।

***

গল্প শেষ হওয়ার পর পুরো ঘর কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলো। আলাউদ্দিন মণ্ডল বললেন, ‘ফেসবুক জিনিসটা আসলে কী? আমাদের যুগে এইগুলা ছিল না। আজকালকার চ্যাংড়া-প্যাংড়া শুনি সারাদিন ফেসবুক-ফেসবুক করে।

বললাম, আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেন চাচা। নিজেই বুঝবেন কী জিনিস।

ছামেদুল বলল, ‘মোর কিন্তুক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে ভাইয়ো। তোমরা কি নামোত আছেন?'

আমি জবাব দেওয়ার আগে আওলাদ মিয়া বলল, ‘আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আজান হবে। আমি বরং আমার গল্পটা বলে ফেলি।'

কারো কোনো আপত্তি নেই। রাত জেগে সবাই বেশ ক্লান্ত। নুরুন নাহার মাঝে মাঝে ঘুমে ঢলে পড়ছে, ফুল মিয়া শব্দ করে হাই তুলছে, শুধু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই সেই ছয় ফুট লম্বা মানুষটার। নির্বিকার হয়ে সে আমাদের কথা শুনছে।

আওলাদ মিয়া এবার বলতে শুরু করলো।

আওলাদ মিয়ার গল্প

আমার নাম মোহাম্মদ আওলাদ মিয়া। পেশা হোটেল ব্যবসা। নর্মালি এই ব্যবসাতেই আমার সমস্ত মনোযোগ। কিন্তু এর বাইরেও আমার একটা জীবন আছে। গত চৌদ্দ বছর ধরে আমি একটা নেশায় আক্রান্ত। সেটা আর কিছু নয়, গল্প শোনার নেশা। আপনাদের যে আজ এখানে জমায়েত করেছি, সেটাও এই নেশার তাগিদেই।

গল্পে গল্পে ইতিমধ্যে রাত কেটে গেছে। আপনাদের জীবনের গল্পগুলো শুনে বুঝেছি সাধারণ মানুষের জীবনেও কতটা অসাধারণ, অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে।

আজ আপনাদের যে গল্পটা বলবো সেটা ঘটেছিল চৌদ্দ বছর আগে। এই ঘটনাটির থেকেই আমার গল্পের নেশা শুরু হয়।

আমার বয়স চুয়াল্লিশ চলছে। অর্থাৎ চৌদ্দ বছর আগে আমার বয়স ছিল ত্রিশ। আমার তখন তুখোড় যৌবন চলছে। কাজ করি নীলক্ষেতের একটা কম্পিউটারের দোকানে। অনার্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলাম। কিন্তু মামা-খালুর অভাবে চাকরি না পেয়ে ঢুকেছিলাম গাউসুল আজম মার্কেটের একটা কম্পিউটারের দোকানে।

বলতে গেলে আমাদের নিজেদেরই দোকান ছিল। আমার চাচা মালিক ছিলেন। দোকানে কাজ করতাম, টাকা-পয়সার হিসাব রাখতাম। চাচা পলাশবাড়িতে থাকতেন। তার কোনো সন্তান না থাকায় জানতাম এই ব্যবসা একদিন আমার হতে যাচ্ছে। সুতরাং, ব্যবসার প্রতি ষোলো আনা মনোযোগ ছিল।

আমার বই পড়ার অভ্যাস ছিল। আমাদের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলো উপন্যাস ছিল। চাচার কালেকশন। ওগুলো পড়তে পড়তে বইয়ের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিলো। সারাদিন দোকানে কাজ করতাম আর সন্ধ্যায় নীলক্ষেতের ফুটপাথে পুরাতন বইয়ের খোঁজ করতাম। আমি মূলত মাসুদ রানা সিরিজের ভক্ত ছিলাম। কাজী আনোয়ার হোসেনের লেখা গোগ্রাসে গিলতাম।

একদিন সন্ধ্যার কথা। পুরাতন বইয়ের দোকানে গিয়ে বই ওল্টাচ্ছি, এমন সময় পাশ থেকে একটা লোক বলল, 'আপনি বোধহয় থ্রিলার গল্পের খুব ভক্ত, তাই না?”

আমি পেছন ফিরে লোকটাকে দেখলাম। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মতো হবে। লম্বা লিকলিকে চেহারা। মাথাভর্তি সাদা চুল নিপুণভাবে বাঁ দিক দিয়ে সিথি করা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে একটা ইয়া মোটা চশমা। লোকটার চোখ পিট পিট করার অভ্যাস আছে।

বললাম, সব ধরনের বই পড়ি। তবে থ্রিলার বেশি ভালো লাগে। ‘আমি এককালে মাসুদ রানা পড়তাম। সেই ধ্বংস পাহাড় দিয়ে শুরু।

‘এখন আর পড়েন না?'

‘নাহ! আর পড়া হয় না। এখন লেখার চেষ্টা করছি। এমন কিছু লিখছি যা কেউ কখনো লেখেনি।'

“তাই নাকি!”

‘হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে। কী করেন আপনি?

'আমি এই নীলক্ষেতেই কাজ করি। গাউসুল আজম মার্কেটের একটা কম্পিউটারের দোকানে বসি।'

‘বাংলা টাইপ করতে পারেন?”

‘কী যে বলেন! টাইপিং দিয়েই তো কম্পিউটার শিখেছি। বাংলা ইংরেজি দুটোই

টাইপ করতে পারি।'

“রেট কত করে নেন?

‘প্রতি পেইজ পাঁচ টাকা। নীলক্ষেতের যা রেট আমাদেরও তা-ই।'

লোকটা কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, ‘ভালোই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। আমার পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করা প্রয়োজন।'

‘চলে আসেন এরমধ্যে। সকাল নয়টায় দোকান খুলি। আটটা পর্যন্ত কাজ চলে।'

লোকটা আসবে বলে কথা দিলো। আমি খুব বেশি পাত্তা দিলাম না। এমন কাজ করিয়ে নেওয়ার কথা অনেকেই বলে। কিন্তু পরে আর আসে না। আসবেই বা কেন? টাইপিং তো এমন কোনো আহামরি কাজ না যে অন্য কেউ পারবে না। যেকোনো দোকানে করিয়ে নিলেই হলো। তবে হ্যাঁ, বানানটা ঠিক হওয়া চাই।

তিনদিন পর লোকটা দোকানে এসে হাজির হলো। হাতে সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। লোকটা বলল, 'আপনার টাইপিং স্পিড কেমন? আমার কাজটা তাড়াতাড়ি হওয়া চাই।'

বললাম, 'টাইপিং স্পিড ভালোই। আপনার কবে লাগবে?"

'পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে দিতে পারবেন?' আমি পাণ্ডুলিপিটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। আন্দাজ দেড়শোর মতো পাতা, গুটি গুটি সুন্দর অক্ষরে লেখা হয়েছে।

বললাম, 'পারবো' ।

লোকটা বলল, 'তবে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে। আমি এখনো পাণ্ডুলিপিটা শেষ করতে পারিনি। যতটুকু লিখতে পেরেছি, ততটুকুই এখানে আছে।'

'সেটা সমস্যা নয়। আমার কাজ টাইপ করা। আপনি পনেরো দিন পরেই আসুন।'

লোকটা অ্যাডভান্স পাঁচশো টাকা দিয়ে বিদায় নিলো। আমার হাতে সেদিন কিছু কাজ ছিল। সেগুলো শেষ করে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসলাম।

ভদ্রলোকের হাতের লেখা খুব সুন্দর। পড়তে একেবারে অসুবিধা হয় না। আমার একটা অভ্যাস ছিল, যেকোনো লেখা টাইপ করার আগে একবার পুরোটা পড়ে দেখতাম। তাহলে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমে যায়। মামা হোটেলের নিচের একটা চায়ের দোকানে কড়া করে এক কাপ রং চা খেয়ে এসে পাণ্ডুলিপিটা পড়তে শুরু করলাম।

খুব সাদামাটা গল্প। ভদ্রলোক একটা ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের কাহিনি লিখেছেন। জমিদারি চলে গেছে দুই প্রজন্ম আগে, এখন পরিবারটির নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা। পূর্বপুরুষের বানিয়ে যাওয়া বাড়ির অবস্থা বেহাল। মাঝে মাঝে ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে। ঋণগ্রস্ত পরিবারটিকে প্রায়ই হেনস্তা করে পাওনাদাররা। এতো কিছুর পরও বাড়ির কর্তার আত্মসম্মানবোধ টনটনে। তিনি নিজেকে মির্জা ইফতেখার মাহমুদের বংশধর হিসেবে পরিচয় দেন, যিনি এলাকার এক অত্যাচারী নীলকর সাহেবের মাথা কেটে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

চরম দুর্দশার মধ্যেও গৃহকর্তা তার শখের জায়গায় ছাড় দেননি। শখটি হলো গল্পের। প্রতিমাসে একদিন তিনি বাড়ির উঠানে গল্প শোনার আসরের, আয়োজন করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে গল্প বলিয়ে আসেন। সারা রাত ধরে গল্প চলে। সাধারণত এই আসরে ঘুরে ফিরে আরব্য উপন্যাস, হাতেম তাই, আমির হামজা কিংবা ইউসুফ-জুলেখার গল্প বলা হয়। কিন্তু এবারে ঘটলো অন্য ঘটনা।

আসরে হাজির হলেন নতুন এক গল্প বলিয়ে। লোকটার আচরণ খুব রহস্যময়। সে গৃহকর্তাকে বলল, আমি সারা রাত ধরে সাতটা গল্প বলবো। আপনার পছন্দ হলে আমার পছন্দমতো উপহার দেবেন, না হলে মেরে পিঠের ছাল তুলে নেবেন। গৃহকর্তা রাজি হলে লোকটা গল্প বলতে শুরু করে।

ভদ্রলোকের দেওয়া পাণ্ডুলিপিতে মাত্র চারটা গল্প ছিল। গল্পগুলো ঠিক কী ধরনের বলে বোঝাতে পারবো না। বিশ্বাস করেন এমন গল্প কখনো পড়িনি, কখনো শুনিনি। পাণ্ডুলিপিটা পড়তে পড়তে কখনো আমার গা শিউরে উঠলো, কখনো হাসিতে গড়াগড়ি খেলাম আবার কখনো চোখ ভিজে উঠলো। মনে হলো, আগে কেন গল্পগুলো পড়লাম না। আমার চোখের সামনে যেন একটা নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গেল।

পাণ্ডুলিপিটা শেষ করে আমার অবস্থা পাগলের মতো হয়ে গেল। বাকি গল্পগুলো পড়ার জন্য মন ছটফট করতে লাগলো। পরের দিন থেকে টাইপিং শুরু করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভদ্রলোকের জন্য। বারবার মনে হতে লাগলো, এই বুঝি ভদ্রলোক এলেন।

কিন্তু তিনি এলেন না। এলেন না তো এলেনই না। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো কিন্তু ভদ্রলোকের আর দেখা নেই। আমি দিন দিন লোকটার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পাগলের মতো হয়ে গেলাম। দোকানে মন বসে না, হাতের কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারি না। বন্ধুরা প্রশ্ন করে, আমার কী হয়েছে?

এভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল। ভদ্রলোক আর এলেন না। আমার তখন দিশেহারা অবস্থা। সারাদিন টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পড়ি আর নিজে নিজে বিড় বিড় করি । পরের তিনটা গল্প আমাকে জানতেই হবে।

এদিকে ব্যবসা পড়তে পড়তে এমন দশা হলো যে দোকানের ভাড়া দিতে পারি না। আমার বৈরাগী দশার কথা চাচার কানে গেল। তিনি দোকান বন্ধ করে পলাশবাড়ি চলে আসতে বললেন। আমি বাড়ি চলে গেলাম। চাচা আমার জন্য মেয়ে

দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। বিয়ের পর আমি পলাশবাড়িতে এই হোটেল খুলি। মানুষ এটাকে 'আওলাদ মিয়ার ভাতের হোটেল' নামে চেনে।

বিয়ের পর কিছুদিন ভালোই ছিলাম। আস্তে আস্তে গল্পের ভূত আবার আমার মাথায় চাপলো। পাণ্ডুলিপির সেই গৃহকর্তার মতো শুরু করলাম গল্পের আসর। বছরে একদিন এই আয়োজন করি।

তেরো বছরে এভাবে অনেক গল্প শুনেছি। মানুষের অজানা অনেক গল্প জেনেছি। তবু আমার গল্পের খিদে মেটেনি। ইচ্ছা আছে, যতদিন বেঁচে আছি, এই গল্প শোনার আসর চালিয়ে যাব ।

ফজরের আজান শুরু হলো। দরাজ গলায় নতুন দিনের ঘোষণা দিলো মুয়াজ্জিন। আওলাদ মিয়া বলল, 'আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সারা রাত জেগে অনেক ক্লান্তি এসেছে নিশ্চয়ই। আপনাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা আছে। তারপর ফুল মিয়া ও সাদ্দাম আপনাদের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

সাদ্দাম নামের সেই আবলুশ কালো লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রথমবারের মতো হাসলো। শিশুর মতো সরল হাসিতে ঝলমল করতে লাগলো আওলাদ মিয়ার হোটেল।

***